বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকায় বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্প

এম.ফিল, (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়

ক্রমিক সংখ্যা	: ০০১৭০০১০৩০১৮
পরীক্ষা ক্রমিকসংখ্যা	: MPBE 181017
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	: 110983 OF 2010-2011

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৯

Certified that the thesis entitled, **''বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকায় বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্প''**, submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Bengali** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at **Kalyani University**, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Registration (2017) of Jadavpur University.

Anutorsha Mukherjee
Roll No. : 001700103018
Reg. No : 110983 of 2010-2011

_____

(Name of the M. Phil Student with
Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declare above, the dissertation work of **Anutorsha Mukherjee** entitled **''বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকায় বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্প''**, is now ready for submission towards the Partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Bengali** of Jadavpur University.

Head **Department of Bengali**	**Supervisor & Convener of RAC**	**Member of RAC**

।। স্বীকৃতি ।।

ভূতের গল্পের সঙ্গে আধুনিকতার বহুমাত্রিক সম্পর্কের ধারণার ইঙ্গিত প্রথম পাই আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক শ্রী আব্দুল কাফির কাছে। তাঁকে বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণার জন্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতকে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন R.A.C কমিটির সদস্য অধ্যাপক শ্রী জয়দীপ ঘোষ এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথি ভৌমিক। তাঁদের মূল্যবান উপদেশ, বিশ্বায়নকে নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। সাধ্যমত নিজের গবেষণা নিবন্ধে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করেছি। তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার কাজ শুরু করবার সময়ে শ্রী নির্মাল্য কুমার ঘোষ ও শ্রী ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত ও সহযোগিতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদেরকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণা কাজের জন্য আমি গোলপার্ক চিলড্রেন্স লাইব্রেরি, আজাদহিন্দ লাইব্রেরি, উত্তরবঙ্গ জেলা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এই গ্রন্থাগারের সকল কর্মীবৃন্দকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা সম্ভব ছিল না।

গবেষণার সময় কিছু পত্রিকা সংগ্রহে সাহায্য করেছে আমার বন্ধু অন্বিতা ও শ্রীতমা। তাদের প্রতি রইল ভালোবাসা।

সর্বোপরি গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সংশয়ী মুহূর্তের সমাধান করেছেন অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এই ঋণ অপরিশোধ্য। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব কীভাবে এসেছে সংক্ষিপ্ত সময়ে, সাধ্যমত সেই বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে পত্রিকার বাইরে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে গবেষণা করবার ইচ্ছে রইল।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-২
প্রথম অধ্যায়	৩-৬
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ভূত	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৭-১১
উনিশ-বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ভূত	
তৃতীয় অধ্যায়	১২-৬৫
বিশ্বায়নের ধারণা ও বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকায় পরিবর্তমান ভূতের গল্প	
চতুর্থ অধ্যায়	৬৬-৯৭
পত্রিকায় ভূতের গল্পের আখ্যান ও ভাষা : পরিবর্তনের চিহ্ন	
উপসংহার	৯৮-৯৯
পরিশিষ্ট ১	১০০-১০৯
পরিশিষ্ট ২	১১০-১১২
গ্রন্থপঞ্জি	১১৩-১১৬

ভূমিকা

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পে পরিবর্তনের সুলুক সন্ধান করাই আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য। বিশ্বায়নের পর থেকেই আখ্যান এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এই গল্পগুলোতে লক্ষ করা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বড়দের ভূতের গল্পের ভূত অশরীরী হয়ে পড়ে। শ্রী আব্দুল কাফি ও শ্রী ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ছায়াশরীর' বইয়ের ভূমিকায় আব্দুল কাফি ভূতেদের সঙ্গে মানুষের মনের অন্ধকার দিকের যে সম্পর্ক তার ইঙ্গিত করেছেন। বিশ্বায়নের আগে পর্যন্ত শিশু-কিশোর পত্রিকার গল্পে অন্ধকারের সঙ্গে এই যোগ কেবলমাত্র বাইরের ছিল। বিশ্বায়নের পরে ছোটদের ভূতও ছায়াময় হয়ে উঠলো।

সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন সম্পাদিত 'উপছায়া' বইয়ের ভূমিকায় সুভদ্রকুমার সেন আধুনিক কালপর্বে কীভাবে ভূতের গল্পের বদল হলো সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেই বদলের চিহ্নগুলো আমাদের গবেষণার ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। শ্রী ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'একুশ শতকে বাংলা ভূতকথা রচনার অভিমুখ' প্রবন্ধে বিশ্বায়নের কালে সামগ্রিক ভাবে ভূতের গল্পের যে পরিবর্তন, তা স্পষ্ট করেছেন। শিশু-কিশোর গল্পের বিবর্তনের ধারা বুঝতে প্রবন্ধটি আমাদের সহায়ক হয়েছে।

আমাদের গবেষণা নিবন্ধে মূলত শিশু-কিশোর পত্রিকায় ভূতের গল্পের পরিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করবার জন্য দুটি পত্রিকা নির্বাচন করা হয়েছে। যথা শুকতারা এবং আনন্দমেলা। বিশ্বায়নের সময়কাল হিসাবে ১৯৯০ পরবর্তী পত্রিকা সংখ্যা এবং তার গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। আমাদের গবেষণার পরিধি বিশ্বায়ন পরবর্তী পত্রিকার গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। সেকারণে পত্রিকার উপন্যাস আলোচনাভুক্ত করা হয়নি।

প্রথম অধ্যায়ে প্রাগাধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভূতেদের যে অবস্থান সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা তৈরি করা হয়েছে। এই সময়ে ভূতেদের স্বতন্ত্র অবস্থান পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশ-বিশ শতকের প্রেক্ষিতে শিশু-কিশোরদের ভূতের গল্পের জগৎকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি বড়োদের ও ছোটোদের গল্প জগতের পার্থক্য কীভাবে উনিশ-বিশ শতকে শিশুদের নির্মাণ ও মনস্তত্ত্বকে স্পষ্ট করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে ভূতের গল্পের বদলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের মনের জগৎ এই সময়পর্বে কীভাবে বদলে গেল তার ইঙ্গিত রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভূতের গল্পের ভাষা, আখ্যান ও চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র বিষয় নয় আখ্যানের ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি ভাষা এবং চিত্রকল্পের যে বদল সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণা নিবন্ধে মুদ্রণের ভুল এবং অন্যান্য ত্রুটির দায় একান্তভাবেই গবেষকের।

প্রথম অধ্যায়

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভূত

বাংলা সাহিত্যে ভূতেদের উপস্থিতি বোঝার জন্য বৃহৎ অর্থে বঙ্গ সংস্কৃতিতে ভূতেদের গতি প্রকৃতি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আধুনিক উপন্যাস বা গোয়েন্দা গল্পের মতো ভূতেদের আমদানি সাগরপারের নয়। এদেশের জল হাওয়ায় তারা বেড়ে উঠেছে। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী জীবনের নির্যাস ভূত বা অপদেবতার কাহিনিগুলোতে ছড়িয়ে রয়েছে।

মানুষের আদিম লোকবিশ্বাস এই ভূতেদের আঁতুড় ঘর। জীবন অতিক্রম করেও মর্ত্য পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ। মানুষই এইসব ভূতেদের কাহিনিকার। ঠিক কোন সময় থেকে এঁরা মানুষের ধারণায় জায়গা নিল এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে জন্মান্তরবাদে।[১] মৃত্যু পরবর্তী অশরীরী সত্তাকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই ভৌতিক ধারণার বীজ নিহিত রয়েছে। উপনিষদের সূচনাপর্বে জন্মান্তরবাদ জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সামাজিক অনুশাসন এবং ন্যায়নীতির বিচারে মানুষ পরকালের ধারণা তৈরি করে। এই ধারণা থেকেই ইহলোকে দুষ্কর্মে লিপ্ত মানুষের পরলোকে ভূত হয়ে থাকার সম্ভাবনা মজ্জাগত হয়েছে। উপনিষদ আত্মার অবিনশ্বরতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং মৃত্যুর পরে আত্মার যে দশা তাই আসলে ভৌতিক অবস্থা। ইহলোকে কর্ম ও জীবন যাপনের ভালো মন্দের উপর নির্ভর করে মৃত্যুর পর তার অবস্থান। স্বর্গ এবং নরক, জনমানসে ভালো এবং মন্দ, পাপ এবং পুণ্য, এই বিপরীত ধারণার জন্ম দেয়। সেকারণে হীনকর্মের অধিকারী ব্যক্তির নরকবাস এবং ভূতদশা সামাজিক ন্যায় বিধানের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতি ও বিশ্বাসে ছড়িয়ে থাকা এই ভূতেরাই জায়গা করে নেয় সাহিত্যে। প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে ভূতেদের উপস্থিতি এবং তার বহুবিধ অর্থ সেই সমাজের সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করে। লোকবিশ্বাসে ভূতেদের প্রতি ছিল ভয়, আর দেবতাদের প্রতি ভক্তি,

যদিও এই ভক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। ভূতের মুখে রাম নাম আসলে অসম্ভবের সূচক। প্রবাদটির মধ্যে দেবতা এবং ভূতেদের যে অবস্থানগত পার্থক্য তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে দেবতাদের বাস সেখানে ভূতেদের আনাগোনা সম্ভব নয়। পাপ, পুণ্যের বৈপরীত্যে দেবতা এবং ভূতেদের নির্মাণের পরিচয় লোকগল্পেও পাওয়া যায়। রেভারেন্ট লালবিহারী দে তাঁর 'Folk Tales of Bengal'[২] বইতে যেসব লোকগল্পের সংকলন করেছেন সেখানে বেশকিছু ভূতের গল্পও রয়েছে। এই লোকগল্পের মধ্যেই ভালো এবং খারাপের বৈপরীত্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। 'ভূত বৌ'[৩] গল্পে ব্রাহ্মণ পরিবারের স্ত্রীকে শাকচুন্নী গাছের কোটোরে আটকে রেখে অবিকল তার রূপ ধরে ব্রাহ্মণের বাড়িতে যায়। অবশেষে হলুদ পোড়া এবং ওঝার মন্ত্রে সে কাবু হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মণস্ত্রীকে গাছ থেকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়। সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাস এই লোকগল্পের অন্যতম উপাদান। প্রেত বা ভূত তাড়ানোর যে মন্ত্র তার মধ্যেও বৈপরীত্যের ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই মানুষ নিজের আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হয়েছে। লোকবিশ্বাসে সে কারণেই ক্ষতিকারক ভূতেদের উপদ্রব এড়িয়ে চলবার জন্য প্রবাদ প্রবচনগুলোতে ভূতেদের বিতাড়নের নানা কৌশল ও উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের লোকবিশ্বাসে ভূতেদের বাস গাছে, বনে জঙ্গলে, কারণ মাটির ক্ষণভঙ্গুর বাড়িতে ভূতেদের চিরস্থায়ী বসবাস সম্ভব নয়। সমাজে শ্রেণি এবং ধর্মকে ভিত্তি করে ভূতেদের উপস্থিতি, সেই সময়ের সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারে ব্রহ্মদৈত্যের স্থান তাই সবার উপরে। জাত ধর্মের চিহ্ন হিসাবে মৃত্যুর পরেও উপবীত পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি।

লোকবিশ্বাসে দেবতা এবং ভূতেদের বিপরীত কোটিতে অবস্থান হলেও পুরাণের আমল থেকে সহাবস্থানের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। পুরানের এই সংস্কৃতির হাত ধরে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই সহাবস্থানের চিহ্ন দুর্লভ নয়। অনার্য সংস্কৃতির দেবতারা যখন আর্য সংস্কৃতিতে নিজেদের জায়গা করে নিলেন, তখন তাদের হাত ধরেই অনার্য

সংস্কৃতির অপদেবতারাও মিশে গেল আর্য সংস্কৃতিতে। পুরাণের গল্পে দেবতা ও পিশাচ উভয়েই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। আর সেই ভয় থেকেই দেবতার প্রতি সম্ভ্রম ও ভক্তি। 'নারদপঞ্চরাত্র'[৪]তে আমরা পাই দেবী ধুমাবতীর কথা যার সঙ্গে ভৌতিক সত্তা মিশে থাকে। নিজেই নিজের স্বামীকে ভক্ষণ করবার পর তিনি বৈধব্য ধারণ করেন। লোকবিশ্বাসে প্রচলিত প্রেতিনির সঙ্গে এই আচরণের মিল পাওয়া যায়। ভূতেদের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক পুরাণ কাহিনিগুলোতে লক্ষ করবার মতো। দক্ষিণ ভারতের শিবের শ্মশানবাস ও ভূত সঙ্গের ধারণাটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ভারতচন্দ্র যেভাবে শিব ও তার ভূত বাহিনিকে এঁকেছেন তাতে হাস্যরসই প্রধান হয়ে উঠেছে।[৫] লোকবিশ্বাসে দেবতা এবং ভূতেদের স্পষ্ট বিপরীতমুখী যে ধারণা ছিল পুরাণের সময় থেকে তার বিবর্তন হয়ে ভূতেরা হয়ে উঠলো দেবতাদের অনুচর। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেবতা ও ভূতের এই সম্পর্কটি লক্ষ করার মতো। কৃষ্ণ অদর্শনে বিরহী রাধার অবস্থা দেখে সখিরা মন্তব্য করেছে তাকে কালিয়া ভূতে ধরেছে। এখানে দেবতা এবং ভূত সমার্থক হয়ে পড়ছেন।[৬] ভূতেদের মতো কৃষ্ণের আস্তানাও কদম গাছ। এই সময় পর্বে ভূতেদের শরীরী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পৌত্তলিকতার দেশে মানুষ দেবতাকে যেমন নির্দিষ্ট আকারে বেঁধেছে, ভূতের ভাবনাও বিমূর্ত হতে পারেনি।

প্রাগাধুনিক সাহিত্যে ভূতেদের স্বাধীন উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। দেবতাদের কাহিনির আড়ালে তাদের আভাসটুকু পাওয়া গেছে মাত্র। দৈবী ভাবনার বিপরীতে আবার কখনো দেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রাগাধুনিক সাহিত্যে ভূতেদের আদল নির্মিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। সাঁতরা, লিপিকা, ‘ঔপনিবেশিক ভূত’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্যতক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ৫৩

২। দে, সন্দীপ, ‘ভূত ও লোকসাহিত্য’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্য তক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ৪৬

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭

৪। বসু, প্রসেনজিৎ, ‘দেবতারে প্রেত করি, প্রেতের দেবতা’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্য তক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ৩৬

৫। রায় গুণাকর, ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬

৬। বসু, প্রসেনজিৎ, ‘দেবতারে প্রেত করি, প্রেতের দেবতা’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্য তক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ-বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে ভূত

উনিশ-বিশ শতকের সময় পর্ব জুড়ে সাহিত্যে ভূতেদের স্বতন্ত্র উপস্থিতি লক্ষ করা গেল। কেবলমাত্র দেবতাদের অনুচর হিসাবে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট রইল না। শিশু কিশোর পাঠ্য সাহিত্যে এই ভূতেদের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবার পর শিশুকিশোর সাহিত্য আলাদা ঘরানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। আর সেই সাহিত্যে ভূতেদের আনাগোনাই সবচেয়ে বেশি।

এই অধ্যায়ে সামগ্রিক আলোচনাকে দুটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(ক) উনিশ শতকে প্রেতচর্চা
(খ) বড়োদের ভূত, ছোটোদের ভূত

(ক) উনিশ শতকে প্রেতচর্চা ঃ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে আমাদের দেশেও উনিশ শতকে প্রেতচর্চা শুরু হয়। একদিকে যুক্তিবাদ অন্যদিকে হিন্দু পৌরাণিকতার আদর্শ। এরফলে মিডিয়াম, প্ল্যানচেট প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল এই সময়ের গল্পে। ১৮৮০ সালে ৩০মে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অফ্ স্পিরিটিচুয়ালিজম।'[১] এর সম্পাদক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয় 'বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি'।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই সময়ে বান্ধব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন প্রেত দর্শনের পাশ্চাত্য আখ্যান।[৩] শুধু গল্প নয়, সরাসরি প্রেত চর্চার বিবরণও লেখা হতে থাকে নানা বইতে। ১৮৭৯-৮০ সালে প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Spiritual Stray leaves' আর 'Stray thoughts on Spiritualism'।[৪] সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রেতচর্চার তাত্ত্বিক ইতিহাস লিখেছেন তাঁর 'বিচিত্র কাহনী'[৫] গ্রন্থে। মৃত মানুষের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এই সময় প্রেত সভার আয়োজন করা হতো, সেখানে প্ল্যানচেটের মাধ্যমে মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলতেন প্রেত সভার সদস্যরা। ঠাকুরবাড়িতেও এই প্রেত চর্চার প্রচলন ছিল। ঊনবিংশ শতকে বিজ্ঞান চর্চায় গড়ে ওঠা আধুনিক যুক্তিবাদ এবং পরলোক চর্চার মধ্যে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ, অক্ষয় দত্তের যান্ত্রিক জড়বাদ, তার বিপরীতে ভারতের থিওসফি আন্দোলন পরলোকের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে আত্মার অবিনশ্বরতাকে স্বীকৃতি দেয়। প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ এদের হাত ধরে থিয়োসফি আন্দোলন কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে।

প্রেত চর্চার ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ইউরোপিয়ানরা পরলোকের দিকে তাকিয়েছেন জ্ঞানের জন্য। অজানাকে জানার আগ্রহেই মূলত এই চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাশ্চাত্যে প্ল্যানচেট চর্চা বাণিজ্যিক ভাবে সফল হয়েছিল। বাঙালি প্রেতচক্রের আয়োজন শুরু করে অবসর বিনোদন আর মনোরঞ্জনের জন্য। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথও প্ল্যানচেট করেছেন কৌতুহল বশে বা কৌতুকছলে।[৬] এরই মধ্যে ব্যতিক্রমী রাজকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র। এরা পরলোক চর্চাকে বিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

কৌতূহল বশে প্রেতচর্চা থেকেই অবিশ্বাসের শুরু যার ফলে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের কাছে তা উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকে পৌরাণিক সংস্কার এবং আধুনিক যুক্তিবাদী মানসিকতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার প্রতিফলন বিশ শতকের ভূতের গল্পে লক্ষ করা যায়। ভূতের অস্তিত্ব নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার বদলে গল্পের আখ্যানে বারবার যুক্তি প্রতিযুক্তি নির্মাণ করে ভূতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস তৈরি করা হয়েছে।[৭] বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের এই দোলাচলে সংশয়টুকুকে আশ্রয় করে বিশ শতকের ভূতেরা ক্রমশ ছায়াময় হয়ে উঠেছে।

(খ) ছোটোদের ভূত, বড়োদের ভূত

উনিশ-বিশ শতকে ভূতের গল্পের মধ্যে মাত্রাগত বিভেদ লক্ষ করা গেল। সমাজ বস্তবতাকে আশ্রয় করে এই সময় বড়োদের ভূতের গল্পের জগৎ তৈরি হলো। শিশু-কিশোরদের গল্পের জগৎ কেমন হবে তাও নির্ধারণ করলেন বড়োরাই। উনিশ শতকে কৈশোরবেলা যাপনের যে আদর্শ তাকে ঘিরেই নির্মিত হল শিশু-কিশোরদের ভূতের গল্পের জগৎ।

জাতীয়তাবাদী ধারণা এই নির্মাণে ইন্ধন দিয়েছিলো। তাদের মতে ভয়ের আবহে ছোটোদের প্রকারন্তরে ভীরু করে তোলা হচ্ছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভূত কথার চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'[৮] প্রবন্ধে জানিয়েছেন ভূতের গল্প যদি পড়তেই হয় তাহলে সেই ভূতের চরিত্র নির্মাণে ভয়ের প্রসঙ্গ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই সময় পর্বের ভূতের গল্পগুলোর মধ্যে নীতিকথার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ করা যায়। 'ভালো ভূত', 'খারাপ ভূত' এই বৈপরীত্য, উনিশ বিশ শতকে ভূতের গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমাজ বাস্তবতার বদলে নীতি আদর্শের স্থান ভূতের গল্পে প্রাধান্য পায় এই সময়। বড়দের গল্পের জগৎ এবং ছোটোদের গল্পের জগতের মধ্যে পার্থক্যের অন্যতম চিহ্ন যৌনতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র তার 'হয়তো'[৯] গল্পে সম্পর্কের জটিলতা এবং যৌন অবদমনের মাঝে অলৌকিকতার আবহ তৈরি করেন। ছোটোদের গল্পের জগতে যৌনতার প্রসঙ্গ উনিশ বিশ শতকের গল্পে দেখা যায় না। ছোটোদের জন্য লেখা ভূত শিকারী মেজকর্তা সিরিজের গল্পগুলোতে[১০] অ্যাডভেঞ্চারের আদলটিকে ব্যবহার করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মেজ কর্তার ভূত শিকারের গল্প গুলোর শুরুতে মেজকর্তার নিজের বলা গল্প রয়েছে, তারপর লেখকের নিজের বক্তব্য রয়েছে। গল্প বলার ধরণ এই সময়ের ভূতের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্পের কাহিনির মধ্যে 'অতীত' সময় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৈঠকী চালের গল্পে ভূতেদের শরীরী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বড়োদের ভূতের গল্পে ভূতেরা নিজেদের শরীরী উপস্থিতির বদলে ছায়াময় হয়ে উঠলো এই সময় থেকেই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ[১১] গল্পে তার আভাস মেলে। সামন্ততন্ত্রের নিদর্শন হিসাবে ভূতেরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখলো শিশু-কিশোর পাঠ্য গল্পে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'হলুদ পোড়া'[১২] গল্পে ভূতের আদলটিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। পাশপাশি এই গল্পে রয়েছে হত্যার প্রসঙ্গ। এই সময়ের শিশু কিশোরদের সাহিত্যে হত্যার প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায় না। বাস্তব সমাজের আঁচ তখনো এসে পড়েনি ছোটদের জগতে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গল্প বলার বৈঠকী ধরণ এই সময়ের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবিশ্বাসের দোলাচল তখনো শিশু মনে জায়গা করে নেয়নি। বেশির ভাগ গল্পের ধরণে রূপকথার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গল্পের সংঘটনকাল থেকে কাহিনিরকালের মধ্যে ব্যবধান গল্পের এই সময়ের আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার মাধ্যমে শিশুমন নিজের বাস্তবকে ভুলে রোমাঞ্চকে উপভোগ করতে পারে।

পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা এবং যুক্তিবাদ বড়োদের ভূতের গল্পের জগৎকে ছায়াময় করে তুলেছে। সেইসব গল্পে হানাবাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কামনা বাসনার সম্পর্ক। উনিশ বিশ শতকের শিশুপাঠ্য ভূতের গল্পে যৌনতার সম্পর্ককে ছিন্ন করে তৈরি হলো হানা বাড়ির গল্প। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মায়া'[১৩] গল্পে ভূতের বাড়ির মায়ায় পড়ে আজীবন সেখানে রয়ে যান কথক। নস্টালজিয়ার প্রতি এই আকর্ষণ বারবার ফিরে এসেছে এই সময় পর্বের গল্পে। ভূতের গল্পের সঙ্গে ভয় অপেক্ষা রোমাঞ্চের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূতের গল্পে[১৪] রোমাঞ্চের পাশাপাশি লেখক সামাজিক নীতির প্রশ্ন এনেছেন। লীলা মজুমদারের গল্পেও[১৫] আমরা পাই ভালো ভূতের কথা। যারা বিপদে পড়া মানুষকে উদ্ধার করে। একসময়ে সামাজিক অবক্ষয় এবং শ্রেণি চেতনার কথা বড়োদের ভূতের গল্পে যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে, শিশুদের গল্পের জগৎকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি।

উনিশ-বিশ শতক জুড়ে ভূতেরা নিজেদের শরীরী উপস্থিতি নিয়েই শিশু কিশোর পাঠ্য গল্পে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের যুক্তি শিশু-কিশোর মনের রোমাঞ্চ ও কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

তথ্যসূত্র

১। ঘোষ, নির্মাল্য, ‘প্রেতপুরাণ’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্যতক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ১০

২। তদেব

৩। তদেব

৪। তদেব

৬। দাশগুপ্ত, মহুয়া, ‘ঠাকুর বাড়ির প্রেত চর্চা : রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্যতক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ৭৪

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ‘মরণ ভোমরা’, *অলৌকিক গল্পসমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৯

৮। ঘোষ, নির্মাল্য, ‘প্রেতপুরাণ’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্যতক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ১২

৯। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ‘প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প’, ভট্টাচার্য্য, সৌরীন (সম্পা.), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩৮-৫২

১০। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ‘ভূত-শিকারী মেজকর্তা’, আনন্দমেলা, সেনগুপ্ত, পৌলমী (সম্পা.), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৯-৭৫

১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, সাহিত্যম, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৯৬

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’, চক্রবর্তী, যুগান্তর (সম্পা.), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ৭৬-৮৩

১৩। ঘোষ, নির্মাল্য, ‘প্রেতপুরাণ’, মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.), সাহিত্যতক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০, পৃষ্ঠা ১৩

১৪। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ‘ভূতেরা বড় মিথ্যুক’, আনন্দমেলা, সেনগুপ্ত পৌলমী (সম্পা.), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৬-৮৩

১৫। মজুমদার, লীলা, ‘অশরীরী’, আনন্দমেলা, তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বায়নের ধারণা ও বাংলা শিশু কিশোর পত্রিকায় পরিবর্তমান ভূতের গল্প

এই অধ্যায়ে নির্বাচিত পত্রিকাগুলির নির্বাচিত গল্প বিশ্লেষণ করে একবিংশ শতকে ভূতের গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব ও তার লক্ষণগুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। ন'এর দশকে 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়নের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হওয়ার পর সারা বিশ্বে 'বিশ্বায়ন' বর্তমানে একটি বহু আলোচিত বিষয়। সেই 'বিশ্বায়ন' এর ধারণা শিশু কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পে কীভাবে জায়গা করে নিল, এই অধ্যায়ে তারই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার প্রেক্ষিতগুলো নির্দিষ্ট করবার জন্য অধ্যায়টিকে তিনটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(ক) বিশ্বায়নের ধারণা :

প্রথম অংশে বিশ্বায়নের সামগ্রিক চরিত্র এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষে এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) বাংলা শিশু কিশোর পত্রিকায় বিশ্বায়নের প্রভাব :

পত্রিকার ভূতের গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব স্পষ্ট করবার আগে, এই অংশে পত্রিকার উপরে সামগ্রিক বিশ্বায়নের কী প্রভাব তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এর মাধ্যমে বিশ্বায়নের চরিত্রটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

(গ) পত্রিকার ভূত ও বিশ্বায়ন :

এই অংশে পত্রিকার গল্পগুলোতে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে বিশ্বায়নের বহুমুখী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি গল্পগুলো এই কালপর্বে এসে কীভাবে বদলে গেল সেটিও আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে।

এই সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের পাশাপাশি গল্পের আখ্যানের উপর নির্ভর করে বিশ্বায়নের কালপর্বে বদলে যাওয়া শিশু কিশোরদের মনস্তত্ত্বের আদলটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

(ক) বিশ্বায়নের ধারণা

বিশ্বায়ন আধুনিক বিশ্বের এমন একটি আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র এবং সম্প্রদায়ের সীমানাকে ক্রম অবলুপ্ত করে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের ধারণা তৈরি করেছে। যার ফলে জাতি রাষ্ট্রের ধারণা উঠে গিয়ে সমগ্র বিশ্ব একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ান ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই বিশ্বায়নের ধারণার প্রসার ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই কেবল মানুষের জীবনধারা আটকে রইল না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হল। বিশ্বায়নের হাত ধরেই আমরা পেলাম মুক্ত বাজারের ধারণা। যেখানে পণ্য দ্রব্য আমদানি - রপ্তানিতে আর কোনো বিধি নিষেধ রইল না।

আমরা আমাদের নিবন্ধে বিশ্বায়নকে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করব। প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মাঝখানের ব্যবধানই উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রাথমিক ভাবে বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যগুলো প্রথমে বোঝা প্রয়োজন। তাহলেই তত্ত্ব আর প্রয়োগের অসাম্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য দরিদ্র দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানো এবং তার ফলে সেই দেশের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা। জাতি রাষ্ট্রের সীমানা ভেঙে গিয়ে মুক্তবাজার তৈরি করেছে বিশ্বায়ন। আর সেই মুক্ত বাজারে পূর্ন প্রতিযোগিতা বজায় থাকবে। এর ফলে ক্রেতা বা ভোক্তার স্বার্থ রক্ষিত হবে। বিশ্বায়নের ফলে আমদানি-রপ্তানির কোনো বিধি নিষেধ না থাকায় দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সুনিশ্চিত হবে এমন ধারণাই বিশ্বায়ন আমাদেরকে দিয়েছে। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতির অবাধ বিনিময়ে সমগ্র

বিশ্বই ভৌগোলিক সীমানা মুছে ফেলে একে অপরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরও সহজ এবং গতিশীল করবার কথা বলে বিশ্বায়ন। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই মুক্ত বাজার তৈরি হবার ফলে মানুষের মেধা ও দক্ষতা সহজেই বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারবে এবং তার সঠিক মূল্যায়ন হবে। ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠে বিশ্বায়ন সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। আর এই বিশ্বমানব বন্ধনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি।

এ পর্যন্ত আসলে বিশ্বায়নের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশার খতিয়ানটুকু পাওয়া গেল। এবার তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে এর প্রাপ্তির অংশ হিসেব করলে বিশ্বায়নের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

মুক্ত বাজার তৈরি হবার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। বিশ্বায়নের ধারণা অনুযায়ী এই বিনিয়োগে দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়বে। অথচ বাস্তব চিত্র হল বিদেশি বিনিয়োগে দেশীয় উৎপাদন কাঠামো এবং দেশীয় শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একের পর এক স্বল্প পুঁজির কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ‘শপিং-মল’ ‘মার্কেটিং কমপ্লেক্স’। এর ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির বদলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুনাফা বৃদ্ধি হয়েছে। মুক্তবাজারে প্রতিযোগিতার কথা বিশ্বায়নের ধারণায় উঠে এসেছিল, অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলিও তাদের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পাবে। অথচ বিদেশী পণ্যের একছত্র আধিপত্যে প্রতিযোগিতা অসম হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ দেশীয় অর্থনীতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে। অনুন্নত দেশের বাজার উন্নত দেশের দখলে চলে গেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের লক্ষ্য সমগ্র বিশ্বকে একক বাজারে পরিণত করে প্রকারান্তরে পুঁজিবাদকেই সাহায্য করা। বিশ্বায়নের প্রভাব এসে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেও। মেধা ও দক্ষতা নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করবার যে কথা বিশ্বায়নের ধারণায় উঠে এসেছিল, সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার মতো পরিকাঠামো বেশিরভাগ দেশেই গড়ে ওঠেনি। শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ সামাজিক শ্রেণি বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

কারিগরি বিদ্যা ও উপযোগবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেধার স্থান সুনিশ্চিত করা যায়নি। পুঁজির ভিত্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ডিগ্রী অর্জন সমাজের সামগ্রিক উন্নতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও। পুঁজিবাদী সভ্যতার আগ্রাসনে তথ্য 'পণ্যে' রূপান্তরিত হয়েছে। মিডিয়া মানুষকে যা দেখায় তা আসলে পুঁজিবাদী মানসিকতারই নির্মাণ। জাতির মেরুদণ্ড গঠনে সংবাদপত্র এবং মিডিয়ার ভূমিকা অপরিহার্য। সেই মিডিয়াই যদি পুঁজিবাদের দাসত্ব করে তাহলে এর চেয়ে বড় সামাজিক সংকট আর কি বা হতে পারে? প্রতিদিন সংবাদপত্রে এবং মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের বহর দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ভারতবর্ষে গণমাধ্যম আসলে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মতো এখানে খবরও কেনাবেচা হয়।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বিশ্বায়ন নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রযুক্তি যে নিরলস বিজ্ঞান সাধনার ফসল, একবিংশ শতকে তা প্রায় বিস্তৃত হতে বসেছে মানুষ। সেকারণে কেবলমাত্র প্রযুক্তিকে ঘিরেই তাদের উন্মাদনা। কম্পিউটারের প্রয়োগ কৌশল অপেক্ষা কম্পিউটারে 'ভিডিও গেম' খেলা বা সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করায় তারা বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে। বিশ্বায়ন এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং সাংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কারণ ইন্টারনেটের বেশির ভাগ তথ্যই ইংরেজিতে। কেউ যদি পুরোপুরি ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল হতে চায়। তাহলে ইংরেজি ভাষায় তাকে দক্ষ হতেই হবে। এর ফলে দেশীয় ভাষায় দক্ষতা কমে সে পুরোপুরি বিশ্বায়িত ইংরেজি ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ভাষার আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতিরই সূত্রপাত এখান থেকেই। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্রই লাভবান হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের অধিকাংশ বাণিজ্যিক সাইটগুলোই শুধু নয় আমাদের রোজকার ব্যবহারের সোশাল সাইটগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্যক্তির নিজস্ব বা ব্যক্তিগত

বলে কিছুই রইলো না। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সবই পণ্য - এমন কী মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোও তার ছোঁয়াচ এড়িয়ে যেতে পারেনি।

বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে তৃতীয় বিশ্বের দেশ, বিশেষত ভারতবর্ষে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। বলাই বাহুল্য ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও এক নির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতি নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক শ্রেণি ভেদে সংস্কৃতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তবে বিশ্বায়ন সংস্কৃতির যে সমতার কথা বলে সেখানেই ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির বিভিন্নতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতি, ধর্মের খোলস ছেড়ে প্রাণপণে আধুনিক মানুষ বিশ্বের দরবারে 'এক' হয়ে মিলতে চায়, অথচ তার ভৌগোলিক পরিবেশ, এতদিনকার সংস্কার বারবার তাকে ফিরিয়ে আনে নিজের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। বিশ্বায়নের কালপর্বে বহুসংস্কৃতি থেকে 'একক' সংস্কৃতির ধারণা মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানকেই বারবার বিপন্ন করেছে।

প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির এই অসামঞ্জস্যের ধারণার মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশ্বায়নের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। সেকারণে কেবলমাত্র পুঁজি ও তথ্য প্রযুক্তির একমুখী বিশ্লেষণে সামগ্রিক বিশ্বায়নের ধারণাকে বোঝা যায় না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামাজিক রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের যে টানাপোড়েন তাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে।

(খ) বাংলা শিশু কিশোর পত্রিকায় বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করার পর, এই অংশে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় বাংলা শিশু কিশোর পত্রিকায় এই বিশ্বায়ন যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার সুলুক সন্ধান করা। পরিবর্তিত সমাজ অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্য এবং সমাজ উভয় উভয়কে প্রভাবিত করে। ঠিক তেমনি ভাবেই পাঠকের চাহিদা এবং জনরুচিকে মাথায় রেখে বিশ্বায়নের সময়ে পত্রিকাগুলি যেমন নিজেকে বিবর্তিত করেছে, আবার বিবর্তনের প্রভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমাজে।

জনরুচি নির্মাণে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অর্থ হচ্ছে মুক্ত অর্থনীতির নামে আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বায়ন। এর মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পাবে। বিশ্বকে একক বাজারে পরিণত করে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আসলে পুঁজিবাদকে সাহায্য করাই বিশ্বায়নের মূল উদ্দেশ্য। এরফলে অনুন্নত দেশগুলো তাদের আত্মরক্ষামূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে দিতে বাধ্য হবে। কারণ এই অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং তথ্য প্রযুক্তি সমমানের উন্নত নয়। আমাদের আলোচ্য গল্পের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি কীভাবে শ্রেণি বিভাজন এবং অর্থনৈতিক অসাম্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে সামাজিক সংকট তৈরি করছে। গল্পের আখ্যান ভাগেই আমরা পেয়েছি 'হাইরাইজ' এবং বস্তির সহাবস্থান। সেকারণে বিশ্বের উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলির প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা ও প্রক্রিয়া। বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করল। আমদানি ও রপ্তানি অবাধ হওয়ায় বিদেশি পণ্যের অভাব রইলো না। দেশীয় উৎপাদন কাঠামো, দেশীয় শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হল।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি ভারতবর্ষে এক মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি করল। তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ইতিমধ্যেই তথ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। খবর তৈরি করাই এখন মিডিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সমাজে তার স্পষ্ট উদাহরণ মেলে। বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপণ, হোডিং প্রলোভন তৈরি করে মানুষকে পুঁজিবাদী পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করেছে। অথচ ইচ্ছা ও সামর্থের মধ্যে যে ব্যবধান তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলস্বরূপ সামাজিক শ্রেণি অসন্তোষ ভেতরে ভেতরে দানা বেঁধে উঠছে। যার বর্হিপ্রকাশ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবণতা।

বিশ্বায়নের কালপর্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতি যে চাহিদা তৈরি করেছে তার প্রভাব এসে পড়েছে শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলোর উপর। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী সময়ে পণ্যায়ণ এইভাবে থাবা বসায়নি পত্রিকার উপর। পত্রিকার প্রচ্ছদ এবং বিজ্ঞাপণের বহর দেখে এই প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। ইন্টারনেট, সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট যখন ছিল না, সেই সময় এই পত্রিকাগুলিই শিশু কিশোরদের দেশবিদেশের সংবাদ জানার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল। সেকারণেই শুকতারার প্রচ্ছদে থাকতো তুতেন খামেনের মমি ও তাকে ঘিরে রহস্যের কাহিনি। আবার আনন্দ মেলার প্রচ্ছদে থাকতো মহাকাশের বর্ণনা বা বিশেষ কোন নক্ষত্রের পরিচয়। স্বভাবতই এই কাহিনিগুলি শিশু-কিশোরদের মনে অপার বিস্ময় ও রহস্য সঞ্চার করত। তার চেনা এই পার্থিব জগতের বাইরের ছবি তার কল্পনাকে উসকে দিত। সর্বোপরি তাদের কৈশোরবেলা জুড়ে যে রোমাঞ্চ ছিল, যা আসলে তারা উপভোগ করত, বিশ্বায়নে সেই রোমাঞ্চের আর কোনো অবকাশ রইলো না। ‘গুগুল’ এখন তাদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দাতা। রোমাঞ্চের সেই শিহরণ থেমে গিয়ে তাদের ঘিরে ধরেছে বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব।

বাইরের বাজার অর্থনীতিতে লাভের দৌড়ে যে প্রতিযোগিতা তার প্রভাব এসে পড়েছে শিশু কিশোরদের জীবনে। সে কারণে বিদ্যালয় কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে রইল না। সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সুনিশ্চিত করতে তা ‘স্টেটাসসিম্বল’ হয়ে দাঁড়ালো। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি এই প্রবণতায় ইন্ধন দিল যথেষ্ট। বিদ্যালয়গুলিও ‘A complete school’ হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল সেখানে গীটার শেখানো হয় কিনা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি দেওয়া হয় কিনা। সমাজে এই চাহিদা যখন তৈরি হল, পত্রিকাগুলো এই চাহিদাকে ইন্ধন করে প্রচ্ছদ কাহিনি তৈরি করল।

২১ পৌষ, ১৩৯৯ আনন্দমেলার প্রচ্ছদে স্থান পেল কলকাতা শহরের বিভিন্ন নামী স্কুলের হদিশ এবং সঙ্গে প্রিন্সিপালদের সাক্ষাৎকার। যে সব স্কুলের নাম এই প্রচ্ছদে

উঠে এসেছে তাদের একটিও সরকারী ‘স্কুল’ নয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে সেইসব বিদ্যালয়ে পড়ানো সম্ভব নয়, তাহলে শিশু-কিশোরদের মধ্যেও শ্রেণি বিভাজনের এই বীজ কি বিশ্বায়নের প্রভাব নয়?

আবার ২৮ চৈত্র ১৪০১ আনন্দমেলার প্রচ্ছদ কাহিনি ‘মেগাসিটি’। শহরের আধুনিকতম সংস্করণ পৌঁছে যাচ্ছে শিশু-কিশোরদের কাছে। ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে তাদের কল্পনার, রোমাঞ্চের জগৎ। বাস্তব বারবার এসে ধাক্কা দিচ্ছে তাদের চেতনার জগতে।

তারাও বুঝতে শিখেছে সমসাময়িক সময়কে। পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রলোভন এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না আর।

২০ ফাল্গুন ১৯৩৮ সালের আনন্দমেলার প্রচ্ছদ কাহিনি লিখছেন প্রদীপ চন্দ্র বসু। তাঁর লেখার বিষয় ‘‘ঘরের মধ্যে পৌঁছে গেছে সারা পৃথিবী।’’ শিশু-কিশোর পাঠ্য পত্রিকার গল্পের প্রচ্ছদে বিশ্বায়ন যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে, তাতে গল্পে তার প্রভাব পড়বে এ বিষয়ে সহজেই কৃতনিশ্চয় হওয়া যায়। ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্রই বর্তমান প্রজন্মের অবাধ বিচরণ। পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলোরও ‘ই-পেজ’ রয়েছে, রয়েছে ‘ব্লগ’। যেখানে সরাসরি পাঠক নিজের মতামত জানাতে পারবেন। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে কেবলমাত্র মুদ্রিত পত্রিকা সংখ্যার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। সেকারণে বিশ্বায়নের কৈশোর আসলে ‘‘ডিজিটালাইজড’’।

এই সময় পর্বে এসে ফ্যাশনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করে, পোশাক পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনের ধারনা বিশ্বায়নের কালে আমূল বদলে গেল। বিভিন্ন শপিং মল জুড়ে তাই বিদেশি কোম্পানির ছড়াছড়ি। পত্রিকা গুলোতে জনরুচির দাবি মেনে উঠে এল সেইসব বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন। প্রসাধনের সামগ্রী থেকে হাল ফ্যাশনের পোষাক সবই জায়গা করে নিল পত্রিকার পাতায়। আষাঢ় ১৪২০

সালের শুকতারা পত্রিকার প্রচ্ছদে উঠে এল হাল ফ্যাশানের ভূত। হাতে আয়না, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখতে মাখতে সে (পেত্নী) ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত। অন্যদিকে ক্যামেরা হাতে তৈরি আরেকটি ভূত। বিশ্বায়নের কালপর্বে ভূতেরাও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের পাল্টে ফেলেছে। আধুনিক মানুষ নিজেদেরকেই বারবার প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বায়নের ভূতেদের মধ্যে দিয়ে। ভূতেরা যেন মানুষেরই অপর সত্তা হয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সমাজের নানা বয়সি মানুষের চাহিদা মাথায় রেখে পত্রিকাগুলো নিজেদের উপস্থাপন করেছে। শিশু কিশোর পত্রিকা ছাড়া আরো একাধিক পত্রিকার মধ্যে সামগ্রিক সমাজের জনরুচি ধরা পড়েছে। 'সুখী গৃহকোণ', 'পরমা', 'সানন্দা', 'আনন্দলোক' ও আরও নানা পত্রিকায় বিশ্বায়নের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। রান্নার নানাবিধ প্রণালী থেকে ঘরসাজাবার উপকরণ সবকিছুরই সন্ধান মেলে পত্রিকাগুলোতে। আধুনিক মানুষ কীভাবে তার ঘর সাজিয়ে তুলবেন সেটিও নির্ধারিত হচ্ছে বাজারের তৈরি করে দেওয়া রুচির উপর। রান্নার প্রণালী ও প্রক্রিয়াকে যেভাবে বিশ্বায়িত করা হয়েছে সেটিও চোখে পড়ার মতো। খাদ্যের রুচিকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে বাজার অর্থনীতি। বিদেশী খাবারের দোকান শহর এবং শহরতলীতে এতো বেড়ে গেছে যে আলাদা করে বাঙালি খাবারের জন্য 'রেষ্টুরেন্ট' তৈরি হয়েছে। বিশ্বায়নের আগে 'পাইস হোটেল' যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। খাবার রুচির এই বিশ্বায়ন মানুষকে রেস্টুরেন্টমুখী করেছে। সেকারণে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পত্রিকায় উঠে আসে রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন।

চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে শিশু-কিশোর পত্রিকার মধ্যেও বিশ্বায়নের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। বয়ঃসন্ধির কালপর্ব জুড়েই কৈশোরের ধারনার নির্মাণ করা হয়। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এই একমুখী ধারণায় বেধে রাখা সম্ভব হল না। বয়ঃসন্ধি কালের মধ্যেও মানসিক পরিণতির স্তর ভেদ দেখা গেল। তেরো চোদ্দ বছর বয়সের সঙ্গে আঠারো উনিশের মানসিক ব্যবধান তৈরি হল। সেকারণে আঠারো উনিশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রেখেই 'উনিশ কুড়ি' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

পুঁজিবাদী সভ্যতার সংস্কৃতি বর্তমান প্রজন্মকে আরও গ্রস্ত করে তুলল এই পত্রিকা। ভোগবাদী জীবন দর্শন তৈরি করে তাদের আরও বিচ্ছিন্ন করে তুলল। সঙ্গে রইলো যৌনতার অনুসঙ্গ যা এই পত্রিকার গল্পগুলিতে যথেষ্ট স্পষ্ট।

ক্রিয়ার বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার মতো বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জোরালো হয়েছে পত্রিকার গল্পে, এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। প্রচ্ছদপত্রেও এর দু-একটি আভাস পাওয়া যায়। চৈত্র ১৪২৫ এর শুকতারার বিশেষ ভৌতিক সংখ্যার প্রচ্ছদে দেখা যায় ভূতেরাই ভূতেদের কে নিয়ে লেখা গল্প পড়ছে। বিশ্বায়নের সময়পর্বের গল্পগুলোতে ভূতেদের সমালোচকের ভূমিকাতে দেখা গেছে। এতদিন পর্যন্ত মানুষের চোখ দিয়ে ভূতেদের জগৎ নির্মিত হয়েছে। একদম সাম্প্রতিকতম পত্রিকা সংখ্যায় এ যেন উলট পুরাণ। এতদিন পর্যন্ত মানুষ তার ভয় রহস্য দিয়ে নির্মাণ করেছে ভূতেদের। কিন্তু বিশ্বায়নের কালে মানুষের বিপন্নতার বোধ তাকে সংশয়ী করে তুলেছে। আর সেই অবকাশে ভূতেরা নিজেদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি জাহির করেছে। মানুষের কর্মকাণ্ডের উপরে একবিংশ শতকে ভূতেরা নিজেদের মতামত তৈরি করছে। এমন কি পড়ে দেখছে তাদের লেখা সাহিত্য।

আষাঢ় ১৪১৯ শুকতারা প্রচ্ছদে হঠাৎ করেই দেখা যায় গ্রাম-বাংলার ছবি। প্রাকৃতিক পরিবেশ তো রয়েইছে সঙ্গে রয়েছে সেকেলে ভূতেদের উপস্থিতি। ব্রহ্মদৈত্যি আহার করছেন, আর পঞ্চব্যঞ্জনে সেই আহার সাজিয়ে পিছনে বসে বাতাস করছেন বামনীভূত। আধুনিক নগরমুখী জীবনের কাছে এই ছবি নিঃসন্দেহে ধাক্কা তৈরি করে। এক মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের পুরানো সংস্কার ও সংস্কৃতির কাছাকাছি। এত ‘হাইরাইজ’ এর মধ্যেও ভূতেরা বারবার ধাক্কা দিয়ে আমাদের নিয়ে গেছে শেকড়ের কাছাকাছি। আধুনিকতা এবং পুরাতন সংস্কারের এই দোলাচল স্পষ্ট হয়েছে এই সময়পর্বের গল্প গুলোতে। ক্যামেরার ব্যবহার শিখে ভূতেরা যেমন আধুনিক হয়েছে তেমনি আধুনিকতার

সমালোচনাও বারে বারে উঠে এসেছে তাদের বাচনে। ভূতেদের সমালোচনার তীব্র বাক্যবাণ থেকে একবিংশ শতকের আধুনিক মানুষ রেহাই পায়নি।

(গ) ''পত্রিকার ভূত ও বিশ্বায়ন''

এই অধ্যায়ে গল্পগুলি পর্যালোচনা করে বিশ্বায়নের প্রভাব ও গল্পের বিবর্তনের চিহ্নগুলিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বড়োদের এবং ছোটোদের গল্পজগতের আদল কী ভাবে আলাদা হয়েছে এবং শিশু-কিশোর পাঠ্য ভূতের গল্প কীভাবে নীতিকথা ধর্মী হয়ে উঠেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত দুটি বিশ্লেষণী মানদণ্ডে গল্পগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(অ) একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক

(আ) অন্যটি মনস্তাত্ত্বিক

তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের প্রভাব একমুখী নয়। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব সবসময় নির্বিবাদে মেনে নেওয়া হয়েছে, এমন ধারণা সঠিক নয়। প্রয়োজন মত প্রতিবাদের সুর জোরালো হয়েছে। বদলে যাওয়া সময় এবং অর্থনীতি ছোটদের সাহিত্যের জগতকেও বদলেছে নিয়ম করে। আবার প্রয়োজন বিশেষে সেই সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেই এসেছে প্রতিবাদ, সামিল হয়েছে ছোটরাও।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এবং ইন্টারনেট নিঃসন্দেহে এই বদলে বড় ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু কেবল বহিঃর্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগই এই বদলের একমাত্র নিয়ামক নয়। বহিঃর্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি যে অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়েছে তাও ধরা পড়ে সাহিত্যে, সর্বোপরি শিশু-কিশোর সাহিত্যও এই নিদারুণ বাস্তব কে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

(অ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত :

শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পগুলির সামগ্রিকভাবে একটি আদল পরিলক্ষিত হয় ন'এর দশকের আগে পর্যন্ত। ন'এর দশক থেকে গল্পগুলির ধরণ বদলে যেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাল তারিখ নির্ধারণ করে কবে থেকে এই বদল হল সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে প্রবণতাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে বিশ্বায়ন এর কালপর্ব অবশ্য এই বিবতর্নকে ত্বরান্বিত করেছে। শিশু-কিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পগুলিতে 'গ্রাম' অবশ্যম্ভাবী একটি উপাদান। নাগরিক সভ্যতার এক ধরণের নস্টালজিয়া রয়েছে গ্রামের প্রতি। শিশু কিশোরদের মনের এই নস্টালজিয়াকে উস্কে দিত গ্রামের ছবি, শিশু মন তার কল্পনায় তৈরি করে নিত তার পছন্দের গ্রামের ছবি। পাশাপাশি আর একটি বিষয়ও লক্ষনীয়, সম্পর্কের সমীকরণও এই গল্পগুলোর অন্যতম উপাদান। বৈঠকী চালের গল্পগুলোতে প্রায়ই গল্পের বক্তা হতেন মামা বা দাদু স্থানীয় আত্মীয়রা। বেশিরভাগ ভৌতিক ঘটনাই ঘটত মামা বা ছোটকাকা বা বড়দাদার সঙ্গে। এমন সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গেই এই গল্পগুলো জমে উঠত যাদের সঙ্গে শাসন অপেক্ষা আবদারের সম্পর্ক অনেক বেশি। আর সবচেয়ে বড় হলো নিরাপত্তা। শিশুমন ভৌতিক আবহকে তখনই উপভোগ করতে পারে যখন সে মনে মনে নিশ্চিত যে সে নিরাপদ। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তার এই নিশ্চিন্ত ভাব আর রইল না। সম্পর্কের বাধনগুলো আলগা হয়ে গেল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প 'আম কুড়োতে সাবধান'[১] গল্পে ঝড়ের রাতে আম কুড়োতে যাওয়া আপাত নস্টালজিক হলেও পুটু যখন বুঝতে পারে অন্ধকারে আমবাগানে তার চিরপরিচিত ছোটমামাই অচেনা হয়ে উঠেছে তখন সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। আপাত ভৌতিক আবহের তলায় অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

নিরাপত্তার পরিসর বাড়তে বাড়তে তা পৌঁছায় নির্জনতায়। আর সেই নির্জনতা জন্ম দেয় একাকীত্বের। আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের পাঠ উঠে গিয়ে শিশু-কিশোররা এখন ফ্ল্যাট বন্দী। নিয়মিত পরিচর্চার দায়িত্বে থাকেন মাইনে করা পরিচারিকারা। মা,

বাবা দুজনেই কর্ম ব্যস্ত। সেকারণে তাদের কৈশোর জুড়ে থাকে নিরাপত্তার অভাব, একাকীত্ব। ভূতেরা এই সময়ে সেই কিশোর কিশোরীদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। অভিভাবকরা সেই খবর রাখেন না। বিচ্ছিন্নদ্বীপের মতো নিজেদের আলাদা করে তাদের বড় হয়ে ওঠা।

এমনই ছবি তুলে ধরছেন মহুয়া দাশগুপ্ত তাঁর ''এক ভূত-মানুষের গল্প'' গল্পে। দাশগুপ্তের এই শিরোনামে বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে, যার মূল বিষয়বস্তু হল কিশোরদের এই একাকীত্ব। তার গল্পের ভূত চরিত্রের নাম ''গোপ্‌লু''। সে ভূত সমাজ থেকে নির্বাসিত মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের এটিও একটি লক্ষ্মণ। গাছপালা, পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হওয়াতে ভূতেদের ভারি আপত্তি আর এ কারণে সর্বসম্মতি ক্রমে মানুষকেই তারা দায়ী করে। গোপলু তাদের মধ্যে দলছুট সে নিয়ম ভাঙার কারিগর।

> ''গোপ্‌লুরা যেখানে থাকে তার পাশে একটা পুরনো বাড়ি আছে। বাড়িটা একদিন ভাঙা পড়লো। মস্ত ফ্ল্যাট উঠলো। ভূতেরা ভারী বিরক্ত। তারা তো প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে। সবাই মিলে চিত্রগুপ্তের কাছে দরখাস্ত পাঠালো। একমাত্র গোপ্‌লুই বেশ কৌতুহলী হয়ে পড়ল। সে মিস্ত্রিদের সঙ্গে সময় কাটাতে লাগল।''[২]

সদ্য তৈরি হওয়া ফ্ল্যাট বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে তার ভারী ভাব। বাচ্চাদের সর্বক্ষণের খেলার সঙ্গী হয়েছে সে। ভূতেদের ভয়ঙ্কর চেহারার আবরণ মুছে গিয়ে অনেক আগেই তারা পেলব হয়ে উঠেছিল। তথাপি তাদের স্থানিক দূরত্ব ছিল। দূরত্ব ছিল মনেরও। ভূতেদের শরীর না থাকলেও তারা মানসিক গুণ সম্পন্ন এমন উদাহরণ অপ্রতুল নয়। বিশ্বায়নের কালপর্বে এই স্থানিক ব্যবধানও ঘুচে গেল। ভূত হয়ে উঠলো ঘরের লোক।

> ''বাচ্চাগুলো ঘরে ফিরলে, গোপলুও ওদের সঙ্গে কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়ে, কোথাও টি.ভি. দেখে, কোথাও কারোর পুডিংএ একটা আঙুল চুবিয়ে মুখে পোরে। যার পুডিং সে চ্যাঁচাতে গিয়েও চ্যাঁচায় না।''[৩]

পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি খাদ্যরুচির বদলও লক্ষ করবার মতো। গ্রামের বাড়ির তেলেভাজা ও বৈঠকি গল্পের আদলকে বদলে দিয়েছে 'পুডিঙ' এর মতো অত্যাধুনিক খাবার। বিশ্বায়ন পরবর্তী গল্পগুলোতে একই সঙ্গে এসেছে বিশ্বায়নের প্রভাব ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। গোপ্‌লু প্রকারান্তরে যেন কিশোরদের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

> ''গোলপুর অনেক দুঃখ। সে ছোট্ট। তার আশেপাশে আছে তারা হয় বড় নয় বুড়ো। কয়েকজনের তো আবার ভূতজন্ম প্রায় শেষ হতে চলল। গোপ্‌লু ইচ্ছে হলেও দুষ্টুমি করতে পারে না। খেলতে পারে না। বয়স্ক ভূতগুলো সারাক্ষণ ধমক-চমক দেয়। কান মুলে দেয়। ওর ঘুমের সময় চিৎকার করে গান গায়।''[৪]

এই ছবি তো আসলে বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের। কম্পিটিশনের দৌড় তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে প্রতিহত করছে। আত্মীয় স্বজন এবং অবিভাবকদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব এত বেড়ে গেছে বলেই ভূতেরা এত মানবী আর এত কাছের হয়ে উঠেছে? অভিমান বশত কি তারা তাদের এই নতুন জগতের সন্ধান বড়োদের দিতে চায় না?

> ''গোপ্‌লু পড়াশুনাও শিখছে। অঙ্কটা ভালোই বাসছে। তাই মানুষ বন্ধুর সংখ্যাও ওর দিন দিন বাড়ছে। গোপ্‌লু ওদের কাছে 'ওপেন-সিক্রেট'। বড়দের এসব কথা ওরা বলে না। ওরা জানে বড়দের মাথায় বুদ্ধি কম। তিলকে তাল করে।''[৫]

নিছক অভিমান হিসাবে উপরের উদ্ধৃতিকে আর পড়া সম্ভব হচ্ছে না। কিশোররা নিজেদের মতামত তৈরি করছে। বিশ্বায়নের কালপর্বে এটি প্রতিরোধেরই নামান্তর।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজি। পারস্পরিক লাভক্ষতির উপর নির্ভর করে চলেছে আধুনিক সমাজ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তার 'তিন আঙুলে দাদা''[৬] গল্পে ওই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছেন এক বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের দোষ ত্রুটি নিয়ে মিলে মিশে থাকে। গল্পে বর্ণিত গ্রামে মানুষ আর ভূতের সহাবস্থান। ওঝারা ভূতেদের বিতাড়িত করতে এলে গ্রামের মানুষরাই বাধা দেয়। তিন আঙুলে এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। ঠাকুমার নেতৃত্বে ওঝার ঘেরাটোপ থেকে পালিয়ে আসে সে। মণিলাল মুখোপাধ্যায় ও তার 'দুঃখীরাম শান্তিরাম'[৭] গল্পে ভূতেদের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক দেখিয়েছেন। দুঃখীরাম বিপদে পড়লেই শান্তিরাম উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত। দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব রয়েছে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের গল্পে ভূতের সঙ্গে সহাবস্থান বা নিবিড় বন্ধুত্ব ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করে কিন্তু ভূত করে না। প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে একে অপরকে নীচু করে শীর্ষে পৌঁছনোর যে নির্মম লড়াই তারই বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে ভূতেরা বারবার করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সেইসব মানবিক মূল্যবোধগুলোকে যা আসলে মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। নিখাদ বন্ধুত্বের উদাহরণ দিয়েছেন শুভ মানস ঘোষ তার 'জেনুইন বন্ধু' গল্পে। দিপ্তাগ্নিবাবু ও শিবাংসু প্রামাণিক দুজনেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। সামান্য একটা ব্যাপারে দুজনের মধ্যে বাক্‌বিতন্ডা থেকে বিষয়টি হাতাহাতিতে পৌঁছায়। শেষে দুজনেই বাড়ি ফিরে যান আহত হয়ে। দীপ্তাগ্নিবাবু খুবই অনুশোচনা করেন এবং লজ্জিত হন। এমন সময় শিবাংশুবাবু এসে তাকে শান্ত করেন এবং বন্ধুত্বের স্বাভাবিক সুর ফিরে আসে। শিবাংশুবাবুর ছেলে দীপ্তাংশুবাবুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করবার পূর্বেই দুজনে থানায় গিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে আসেন। পুলিশের মাধ্যমে পরে দীপ্তাংশুবাবু জানতে পারেন একদিন আগেই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। বন্ধুত্বের দাম রেখেছেন শিবাংশু প্রামাণিক।

পুলিশের কাছে ভূতের সশরীরে উপস্থিতিও বিস্মিত করে না, যখন ব্যঞ্জনায় বন্ধুত্ব রক্ষার দায় থাকে।

> ''দীপ্তাগ্নিবাবু আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, দেবুর দিকে চেয়ে ঘোরের মাথায় বলতে লাগলেন, শোনো দেবু, যতই আমরা লড়াই - ঝগড়া করিনা কেন, আমরা কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বন্ধুই ছিলাম, জেনুইন বন্ধু''।[৮]

বিশ্বায়নের কালপর্বে ভূতের গল্পে সমাজ বাস্তবতার নানাদিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধ ও সম্পর্কের সমীকরণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনি অর্থনৈতিক অসাম্য, শ্রেণি চেতনার কথাও শিশু-কিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। স্যাটেলাইট, মিডিয়া, সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট যেমন বিশ্বায়নের উপাদান হিসাবে গল্পে স্থান পেয়েছে, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে এই স্যাটেলাইট রাজত্বের বিরোধী কণ্ঠস্বরও জোরালো হয়ে উঠেছে। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা' গল্পে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। অসহায় মানুষ নিজেদের রক্ষার জন্য ভূতেদের উপর বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। অশরীরী ভূতেদের কোনো পেশা ছিল না। 'ভূত-গোয়েন্দা' শব্দবন্ধটি লক্ষ করার মতো। বিশ্বায়নের প্রভাবে ভূতেরা আর কেবল হানাবাড়ি আগলে বসে নেই। মানুষের স্বার্থে গোয়েন্দার ভূমিকাতেও তাদের অবতরণ ঘটল।

> ''শিবু খুড়ো হাতের খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, দূর দূর! কাগজ খুললেই শুধু চতুর্দিকে খুন খারাপি আর সন্ত্রাসের খবর। মেয়েদের, বাচ্চাদের অপহরণ! এই কি স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজীর দেশ!''[৯]

সামাজিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সমসাময়িক হলেও নতুন নয়। লক্ষ করবার বিষয় এই প্রতিবাদের ভাষা স্থান পাচ্ছে কিশোর সাহিত্যে। খুন খারাপি, সন্ত্রাস এসবের সঙ্গে বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে শিশু কিশোরদের সম্পর্ক ছিল না। মিডিয়ার দৌলতে এই অবক্ষয়ের ছবি এতটাই স্পষ্ট যে হিংসার ছবিকে আড়াল করে কেবল সুকোমল

মনোবৃত্তির চর্চা এই কালপর্বে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিশোররাও এই সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে অবগত, তাদের মানসিক গঠন বদলেছে সমাজ বদলের সঙ্গেই। মেয়েদের অপহরণের মতো বিষয় আর তাদের কাছে গোপন করে রাখবার দায় লেখকেরা অনুভব করলেন না। তারা চাইলেন কিশোররাও বুঝতে শিখুক তাদের আগামী সমাজকে।

রূপক চট্টরাজের গল্প, 'চন্দনপুরের এক রাত' গল্পে ভূত অপেক্ষা মানুষই যে শতগুণে ভয়ঙ্কর সে বিষয়টি স্পষ্ট করা রয়েছে। ভৌতিক আবহ যে আসলে মানুষেরই মনের অন্ধকার তার ইঙ্গিত মিলবে এই গল্পে। প্রসঙ্গত আরও কয়েকটি গল্পের উদাহরণ দিয়ে মানুষের মনের এই অন্ধকারকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বাইরে এত আলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাতকাহন যে তার মধ্যে ভূতকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে কেবল অন্ধকারকে আশ্রয় করলেই চলবে না। ভূতের গল্পে অন্ধকারের 'মোটিফ' রয়েছে, অথচ তা বাইরের নয়, মানুষের মনের অন্ধকার। সেই কারণে প্রচেত গুপ্ত তাঁর গল্পের নাম দেন 'দিনের বেলাতেও ভূত দেখা যায়।'

রূপক চট্টরাজ তার গল্পে লিখছেন -

> ''আমাদের মনের মধ্যে অজানা জিনিসের একটা ভয় বা ভীতি আছেই। হয়তো মনের সেই অন্ধকারটা অনেক সময় বড়ো আকার ধারণ করে।''[১০]

সে কারণেই ভূতের দেখা পাওয়ার জন্য আর কোনো নির্দিষ্ট নির্জন অন্ধকারময় স্থানের প্রয়োজন হল না। ভূতেদের সঙ্গে আমাদের স্থানিক দূরত্ব কমে গেল। বিশ্বায়ন যতই সমগ্র বিশ্বকে একটি মাত্র গ্রামে রূপান্তরের কথা বলুক না কেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের অভিঘাতে আসলে আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম হয়েছে। স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের চারপাশে যে অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে সেটিও ক্রমাগত মানুষকে নিঃসঙ্গ করেছে। আর তার অস্তিত্বকে করেছে বিপন্ন। বিপন্নতার এই সুযোগ নিয়ে

শহরের জমকালো পরিবেশেই বেড়েছে ভূতেদের আনাগোনা। মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে তাদের কোন অসুবিধে নেই। বরং বিপদের দিনে মানুষের পাশে মানুষকে পাওয়া ভার। ভূতেরাই এই দুর্দিনে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চন্দনপুরে কথক বিপদে পড়লে অশরীরী লছমন্ ও হীরামতীই তাকে সাহায্য করে। পরপোকারী ভূতের গল্প আমরা আগেও পেয়েছি, খেয়াল রাখা প্রয়োজন আখ্যানে এই উপকারের 'মোটিফ' কে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পের কথক যখন বলেন -

> ''ওরা জ্যেঠুর মুখে এর আগে অনেক গল্প শুনেছে, কিন্তু কোনো আত্মার এইরকম আতিথেয়তার কাহিনি কখনও শোনেনি। ভূত মানে যে শুধু ভয়ের ব্যাপার নয় সেটা ওদের কাছে পরিষ্কার হলো।''[১১]

আত্মার এই আতিথেয়তা বিশ শতকের গোড়ার দিকে সত্যি চোখে পড়েনি। সেই সময়ের ভূত অনেক বেশি তার ভয়াভয়তা নিয়ে মূর্তিমান। বলা যেতে পারে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে তারা বড় বেশি তৎপর, খানিকটা উদ্বিগ্নও বটে। সে কারণে মানুষের পরিচিত জগতে বারবার নিজেদের উপস্থিতি জাহির করে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছে। বিশ্বায়নের সময় থেকেই ভূতদের শরীরী উপস্থিতি বিলুপ্ত হতে থাকল। বড়দের ভূতের গল্পে শরীরী অস্তিত্বের বিলোপ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই শুরু হয়ে গেছে। শিশু কিশোর পত্রিকায় ন'এর দশকের আগে পর্যন্তও ভূতের শরীরী উপস্থিতি দুর্লভ ছিল না। একবিংশ শতকের কাছাকাছি সময় থেকেই ভূতেরা ছায়াময় হয়ে উঠতে শুরু করল। মানুষের চেহারার সঙ্গে আর তাদের কোনো প্রভেদ রইল না। মণিলাল মুখোপাধ্যায়ের 'দুঃখীরাম শান্তিরাম' গল্পে অশরীরী শান্তিরাম মানুষের ভূত বিশ্বাসের যে অনিশ্চয়তা তার সম্পর্কে মতামত জানাচ্ছে।

> ''ঐ স্যার, আপনাদের দোষ, মুখে বলবেন ভূত বলে কিছু নেই, অথচ গা ছম্‌ছমে ভূতের গল্প পেলে সবার আগে পড়বেন। এই যে আমি নেই অথচ আছি। আপনার সঙ্গে কথা বলছি।''[১২]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে ভূতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়ে পড়লো মানুষ। সে কারণে কোনো অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা করবার সময় প্রথমেই সে অশরীরী অস্তিত্বে বিশ্বাসী হল না। যুক্তি ও প্রতিযুক্তি দিয়ে সেই ঘটনার বিজ্ঞানোচিত ব্যাখ্যা খোঁজবার চেষ্টা করল। মানুষের বিশ্বাসের এই 'থাকা' বা না থাকার মাঝামাঝি যে দোলাচল তা ভূতেদের অজ্ঞাত রইল না। মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝে তারাও নিজেদের মতামত পেশ করল। বিশ্বায়নের সময় থেকেই ভূতেদের এই নির্মাণ শুরু।

অস্তিত্বের প্রসঙ্গে 'থাকা' এবং 'না থাকা' এই দুটি, শিশু কিশোর পত্রিকার ভূতেদের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। থাকার (শরীরী উপস্থিতি) বিপরীত 'না-থাকা' (শরীরের উপস্থিতি নেই) এই সহজ বৈপরীত্যে ভূতের গল্পগুলোকে আর পড়া সম্ভব নয়। এই না থাকাটাই বিকল্প এক অস্তিত্বের জানান দিল। ক্রমাগত অস্বস্তির মুখোমুখি করল বিশ্বায়নের সমাজকে।

কঙ্কক সরকারের 'ভূতের সঙ্গে দেখা' গল্পে এই অস্বত্বির ছবি ধরা পড়েছে। মফস্বল শহরে সম্প্রতি মারা গেছেন দুর্গা প্রসাদ হাতি। লোকমুখে শোনা যায় তার সৎকার ঠিক মতো হয়নি। অবিলম্বেই পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো দুর্গাপ্রসাদ বাবুর বাড়িকে ঘিরে নানা গল্প। লোকে মাঝে মাঝে দুর্গাপ্রসাদকে দেখতে শুরু করল।

> ''ঠিক দুর্গাপ্রসাদ নয় তার ছায়া। প্রলম্বিত ছায়া দিনে রাতে সন্ধ্যায় কখনও কখনও কারো চোখে ধরা পড়তে লাগল। ঠিক যা যা দেখা গেল তারা চাইতে অনেক অনেক বেশি শোনা গেল লোকমুখে। লোকটার আত্মা এই রাস্তায় চলাচল করছে! ক্রমে পাড়া জুড়ে গল্পের ভূত ছোটবড় সকলের মুখে রোমাঞ্চকর ফুর্তির মতো খই হয়ে ফিরতে লাগলো![১৩]

প্রথমেই লক্ষ করবার, দুর্গা প্রসাদ বাবুর প্রলম্বিত ছায়া নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে কেবল মাত্র রাতের অন্ধকারকে বেছে নেয়নি। মফঃস্বল শহরেও আর অন্ধকারের তেমন

বাড়বাড়ন্ত নেই। তাই দিনের বেলাতেও ছায়ারা যত্রতত্র বিচরণ করে বেড়ায়। পাশাপাশি জনশ্রুতির আদলটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। অশরীরীদের মূল উদ্ভব তো এই জনশ্রুতি থেকেই। বিশ্বায়নের কালপর্বে পার্থক্যটা এখানেই যে এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ রূপে সর্বজনগ্রাহ্য হবার দায়ভার থেকে মুক্ত হলো। বিশ্বাস করা না করা শ্রোতার উপরে। অবিশ্বাসের বীজ যে রয়ে গেল তার প্রমাণ 'রোমাঞ্চকর ফুর্তি' শব্দ বন্ধটি। ভয় নয়,আতঙ্ক নয়। দুর্গাদাসবাবুর জনশ্রুতিটি আসলে সাধারণের মধ্যে আমোদ তৈরি করে। এই গল্পের কথক অন্য মফঃস্বল শহরে ফুটবল খেলতে যায়। সেখান থেকে দুই বন্ধু ফেরার সময়ে যথেষ্ট ভৌতিক আবহের উপাদান থাকলেও বাড়ির একদম সামনে এসে দুর্গাদাস বাবুর বাড়ির সামনে তারা দু'জনে সেই ছায়ামূর্তি দেখতে পায়। শুনতে পায় তাদের নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

> ''গলির মধ্যে তেমন আলো নেই। গালগল্পে মেতে থাকলেও ভয়ের একটা চোরা স্রোত মনের মধ্যে ঘাই মারছে। অন্ধকার গলি পথে ফ্যাকাশে একটা আলোর স্পর্শ যেন দেওয়ালগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। সঙ্গে বীভৎস একটা অজানা আশঙ্কা।''[১৪]

সেই ডাক আসলে কথকের বন্ধুর। অন্য পাড়া থেকে এসে তারাই দুর্গাদাস বাবুর বাড়িটা কিনেছে। এই অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম বিশ্বায়নের সময়ে ভূতেদের সঙ্গে মানুষের স্থানিক দূরত্ব কমেছে। বাইরে অন্ধকার কমলেও বেড়েছে মনের অন্ধকার। সেই অন্ধকারই বারবার আমাদের অস্বস্তি দিচ্ছে। বিপন্ন করেছে অস্তিত্বকে। আর এই বিপন্নতার সূত্র ধরেই জন্ম নিচ্ছে এইসব ছায়া শরীরেরা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প 'সানরাইজ লজ' গল্পেও এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচল এবং অস্তিত্বের সংকট লক্ষ করা যায়। কর্পোরেট অফিসের কাজে অবনী মেঘতাররু এসেছিল। ভেবেছিল দিন থাকতে থাকতে কাজ চুকিয়ে ফিরে যাবে টাটানগর। স্থানীয় লোহাখনির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মিটিং যখন শেষ হল সারান্তা পাহাড়ে তখন সন্ধ্যে

নেমে গেছে। গ্রামবাংলার ভূতুড়ে পরিবেশের বদলে কর্পোরেট অফিসের প্রসঙ্গ এই গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। কাজের চাপে এতদূর আসতে হয়েছে তাকে, নইলে কোম্পানির কর্মকর্তাদের মন জুগিয়ে চলা মুশকিল হয়ে পড়বে। ভৌতিক আবহে প্রবেশের আগেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কর্পোরেটের ঝা চকচকে জীবন আসলে মানুষকে চরম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোর্ট প্যান্ট পরা এই কর্পোরেটের কর্মচারীরা নিজেদের শ্রমিক বলে স্বীকার করতে পারে না, আবার পুঁজিবাদী মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তারা মালিকও নয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে এখানেও দুটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের মাঝামাঝি রয়েছে তারা। এই সংকট নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বেশি। পেশাগত বিরক্তির পাশাপাশি নিজের উর্ধস্তন সহকর্মীর ব্যবহারের প্রতি মতামত তৈরি করছে অবনী।

> ''ফোনেই হোটেলে যাওয়ার পথ বাতলে দিলেন জগন্নাথ মিশ্র, মোবাইল অফ করে অবনী যেন একটু স্বস্তি পেল। অবশ্য বিরক্তও হয়েছে মনে মনে। জগন্নাথ তাঁর নিজের বাড়িতেও তো একরাত্রির জন্য থাকতে বলতে পারতেন তাকে। এ দুনিয়ায় সবাই নিজের ধান্দায় ঘোরে.....''[১৫]

বিশ্বায়ন বিচ্ছিন্ন করেছে মানুষকে। বিচ্ছিন্ন করেছে প্রকৃতির কাছ থেকে। নিজেদের মননের চর্চা বন্ধ করে সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে যে বন্ধুপ্রীতি,এ সময়ের উপহাস ছাড়া আর কি বা হতে পারে! সে কারণে সানরাইজ লজের সন্ধান এবং তার বদনাম সম্পর্কে অবহিত করার পরেও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন জগন্নাথ। এই বিচ্ছিন্নতাই আসলে গল্পের পরের অংশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সানরাইজ লজের ভূতুড়ে বদনাম শোনার পর থেকেই অবনীর অবচেতনে সেটি দানা বেঁধে বসে, অথচ তার আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে কথা। চারিপাশে সতর্ক সাবধানী দৃষ্টি রেখে চলে সে। লজের সামনে এসে বহু ডাকাডাকি করার পর দারোয়ানের দেখা মেলে। দারোয়ানের বেশভূষা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অবনীর ধারণা হল এ অশরীরী। বিশ্বায়ন

মানুষের জীবনকে যেমন দ্রুত করেছে। ভাবনা ও সিদ্ধান্তের মাঝেও তিলমাত্র ব্যবধান রাখেনি।

> ''গলা শুনে অবনী নিশ্চিত হয়ে গেল, এ এক অশরীরী। গা ছমছম করে উঠলেও মুখমণ্ডলে ভয়ের ছাপ পড়তে দিল না। গলা খাকারি দিয়ে বলল - রাতে থাকবো।''[১৬]

অবনীর প্রস্তাবে দারোয়ান সম্মত হলো। রাতে শুধুমাত্র থাকা নয় খাবারের বন্দোবস্তও হলো। অবনী ভেবে দেখলো ভূত যদি উৎপাত না করে এরকম সৌজন্য দেখায় তাহলে মন্দ কী! সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘুম ভেঙে অবনী দেখলো মেজর মুখার্জী, যিনি একটু আগেই অবনীর সঙ্গে আলাপ করে গেলেন, তিনি এবং তার ভাই হোটেলের মালিকানা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত। তারপরই বন্ধুকের আওয়াজ এবং দুটো রক্তাক্ত দেহের ঘরে পড়ে থাকা। এসব দেখে অবনী জ্ঞান হারায়। পরদিন সকালে দারোয়ানের আওয়াজে ঘুম ভাঙে। দারোয়ান জানায় সম্পত্তির জন্যই দুভাইয়ে বচসা আর তারপরেই রক্তারক্তি কাণ্ড। সেই থেকেই প্রতিদিন রাত্রে এই বীভৎস্য দৃশ্যের অনুবর্তন। গল্পের শেষে এসে জানা যায় দারোয়ান মোটেই অশরীরী নয়। গল্পের শেষ অংশে এই দুটি ঘটনা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। প্রথমটি সম্পত্তি নিয়ে বাক্-বিতন্ডা। সহজেই অনুমেয় এ আসলে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ারই চিহ্ন। লাভের অংশ কেউ কম পেতে চায় না। সবাই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। আর ব্যক্তিগত মুনাফার লিপ্সা এতোটাই প্রবল যে মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে ভাইকে হত্যা পর্যন্ত করা সম্ভব। গল্প কথক কি কেবল এই ভূতুড়ে দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারালেন? নিশ্চয় নয়। দৃশ্যটি দেখবার সময় একবারও তার অবচেতনে ভৌতিক আবহ কাজ করেনি। কথকের ভয়ের কারণ ঘটনার বীভৎস রূপ ও আকস্মিক ঘটন। তাই আপাত ভৌতিক আবহ থাকলেও মানুষের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা তার চেয়েও ভয়ানক। বানিয়ে তোলা ভূতুড়ে ভয় সেখানে নিঃসন্দেহে নাবালক। বিশ্বায়ন ভূতের গল্পের রূপকে মানুষের ভয়াবহতাকেই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথ বাবুর কাছে বাড়িটির ভৌতিক

বদনাম সম্পর্কে অবহিত হবার পর থেকেই কথক সবকিছুতেই ভৌতিক অনুষঙ্গ খুঁজে বার করছিলেন। ঠিক সেকারণেই দারোয়ানকে প্রথম দেখাতেই তার অশরীরী বলে বোধ হয়েছিল। জীবনের দ্রুততার সঙ্গে এই সময় পর্বে ভাবনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমে গেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত মানুষ নিজেকে প্রকৃতির থেকেও প্রতিস্পর্ধী ভাবতে শুরু করেছে। গোটা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় পেয়ে মানুষ মনে করে তার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই। এমন কী বিগত দুটো বিশ্বযুদ্ধ থেকেও সে শিক্ষা গ্রহন করেনি। অথচ প্রকৃতির পরিহাস এমনই, মানুষের চিন্তাভাবনার বাইরে গিয়ে মুহূর্তে মানুষকে হতবাক্ করে সে নিজে অস্তিত্ব জানান দেয়। গল্পের ভৌতিক আবহকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবলমাত্র গল্পের মধ্যে থেকে সম্ভাবনার বীজটুকু কে পর্যবেক্ষণ করতে চাইছি, বাইরের প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে মানুষ যতই শক্তিশালী হয়েছে, ভেতরে সে ততই অসহায়। অসম্ভবের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করতে অপারগ। ভিতরের এই নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা বারবার মানুষকে মুখোমুখি করে তোলে তার মনের জমাট বাধা অন্ধকারের সঙ্গে, তারই অন্তঃকরণের ভূতের সঙ্গে।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তার প্রমাণ পূর্ববর্তী গল্পের আলোচনায় আমরা পেয়েছি। সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া যে অর্থনীতি তাতে সামাজিক শ্রেণির ধারণাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জয়দীপ চক্রবর্তীর গল্প ‘স্কুলের টানে’-এ আমরা সামাজিক শ্রেণির অবস্থান কে চিহ্নিত করতে পারি। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সোমনাথ সদ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরি নিয়ে এসেছে রামগোপালপুরে। উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা থাকলেও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে চাকরি নিতে বাধ্য হয়। বিকল্প কোনো রাস্তাই আর খোলা ছিল না।

> ‘‘.....আসলে এই বাজারে পাওয়া চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সাহস তার হয়নি।’’[১৭]

উপরের উদ্ধৃত লাইনটিতে ‘বাজার’ এবং ‘সাহস’ শব্দ দুটি লক্ষনীয়। বিশ্বায়নের ধারণায় বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা মুক্ত বাজার নীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষে অনুরূপ একটি ‘বাজার’ তৈরি করেছে। নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষিতে প্রথম ‘বাজার’ অপেক্ষা দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্র। আর ভারতবর্ষের ‘বাজার’ যে স্থিতিশীল নয় তার প্রমাণ, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সাহস হয়নি সোমনাথের। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সকলের এই সুযোগ গ্রহণের পরিস্থিতি নেই। অর্থনৈতিক কারণেই ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে মফঃস্বলের স্কুলে শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ করতে হয়েছে বাধ্যত। বিশ্বায়নের চরিত্র বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ করেছিলাম এর চরিত্র একমুখী নয়। অর্থাৎ কেবল ইন্টারনেট, সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট দিয়ে বিশ্বায়নের বিচার ভীষণ একমাত্রিক। এত আলোর নীচে জমাট বাধা অন্ধকারও বিশ্বায়নেরই প্রভাব।

সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাধ্য হয় সোমনাথ চাকরি নিতে। অথচ সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে শাসক ও শোষিতের অবস্থান সর্বদা পরিবর্তনশীল। যে সোমনাথ অর্থনৈতিক কারণে রামগোপালপুরে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে, এখানে আসবার পরে এখানকার মানুষজন সম্পর্কে সে যে মতামত তৈরি করে তা উচ্চ কোটির -

> ‘‘এই লোকগুলোকে দেখলে মজা পায় সোমনাথ। এই একবিংশ শতাব্দীতেও কী অদ্ভুত অন্ধ সংস্কারের জালে জড়িয়ে রয়েছে এরা। সোমনাথ নিজে বরাবরই ডাকাবুকো ছেলে’’[১৮]

সোমনাথের এই দেখা কি কেবল যুক্তিবাদ দিয়ে কুসংস্কারকে দেখা?এর মধ্যে কি কোনো শ্রেণি উন্মাসিকতা নেই?শহুরে ধ্যান ধারণার কোন ছাপ নেই উদ্ধৃতাংশটিতে? যে বিশ্বায়ন ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিল, সেখানের কোনো গ্রামে যদি বিশ্বাসে ‘কুসংস্কার’ থাকে, (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘কুসংস্কার’ এই ভাবনাটি একান্তই নাগরিকমনস্ক সোমানাথের চাপিয়ে দেওয়া। রামগোপালপুরের মানুষদের কাছে তাদের বিশ্বাসই তাদের সংস্কার।) সেই কুসংস্কার কি বিশ্বায়নের ব্যর্থতা নয়? পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা ও যুক্তিবাদ

কি কেবল নাগরিক সমাজের অধিকার?একাংশের বিশ্বায়নই কি তাহলে সামগ্রিক বিশ্বায়নের ধারণা নির্মাণ করেছে?শুধু গ্রাম বা শহরের বিভাজন দিয়েও কি বিশ্বায়নের শ্রেণি বৈষম্যকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব? নাগরিক সভ্যতার মধ্যেও কি শ্রেণির বিভাজন নেই? না হলে শহরের ছেলে সোমনাথকে অর্থনৈতিক কারণে উচ্চশিক্ষার বাসনা বিসর্জন দিয়ে চাকরি নিতে হবে কেন? আর চাকরির বাজার কেমন, সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

রূপক চট্টরাজের গল্প 'ভূতের ভয়ে' গল্পে নাগরিক সভ্যতার মধ্যেও শ্রেণি বৈষম্যের ছবিটি স্পষ্ট করা আছে। গল্পের কথক রাতের বেলা বই পড়তে পড়তে দেখা পায় মদন রিক্সাওয়ালার। একবার বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে আসায় সে সাহায্য করেছিল। কথক জানেন সে মৃত, তবুও কথোপকথন চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হলো না। কথকদের ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের পিছনের দিকের বস্তিতেই মদনের বাস ছিল। নাগরিক সভ্যতায় একই সঙ্গে ফ্ল্যাট বাড়ি এবং বস্তির অবস্থান। শ্রেণি বৈষম্যের ধারণাটি এই ছবি থেকেও স্পষ্ট। শুধু তাই নয় মৃত্যুর পর সে আস্তানা গড়েছে নরহরির বাগানে ঝাকুর মাকুর গাব গাছে। মৃত্যুর পর মদন রিক্সাওয়ালার কিন্তু কোনো হানাবাড়ি জুটল না। সে নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে স্বতন্ত্র রয়ে গেল। বস্তির পাশে 'হাইরাইজ' যেভাবে বিশ্বায়নকে গ্রহণ করেছে, বস্তির এঁদো ঘরগুলিতেও বিশ্বায়ন কী একই আবেদন রেখেছে?

সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলছে ভূতেরাই। দীপ চক্রবর্তী তার গল্প 'ভূতেদের বিপ্লব'-এ অশরীরীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধেও স্বর জোরালো হয়েছে এই গল্পে। অমাবস্যার দিনে ভূতেদের সভা বসেছে। তাদের আলোচনার বিষয় মানুষের অপকর্ম এবং সেই কারণে ভূতেদের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। সমবেত ভূতেদের প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে তাদের সমস্যার কথা জানায়।

''কোনো কারণ ছাড়াই মানুষ যেভাবে মানুষকে খুন করছে তাতে ভূতেদের চক্ষু চড়কগাছ। এবং এই কাণ্ড কারখানায় ভূতের সংখ্যা যেভাবে চড়চড় করে বাড়ছে, ভূতেরা এখন চরম অস্থিরতায়। শুধু কি তাই? প্রোমোটিং এর নামে যেভাবে হেরিটেজ বিল্ডিং ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, নগর উন্নয়নের নামে যে নিষ্ঠুরভাবে গাছপালা ধ্বংস করে বসতবাড়ি হচ্ছে, তাতে করে ভূতেদের বসত হচ্ছে নড়বড়ে। একে ঘোস্টুলেশন, তারপরে থাকার জায়গার অভাব। শুধু তাই নয় গন্ধ, মানে ভূতেদের খাদ্য তারও অভাব দেখা দিয়েছে। ইট, সিমেন্ট, লোহার বাড়িতে কী গন্ধ থাকে যে ভূতেরা খাবে? আরে বাবা সবসময় আতর দরকার নেই, পুকুর, জলাজমি হলেই চলে যায়। কিন্তু মানুষ তো সে উপায়ও খোলা রাখছে না। প্রথমে জলাজমি বুজিয়ে খেলার মাঠ। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেখানে বসত। ভুতেরা ঠিক করেছে এর একটা বিহিত দরকার।''[১৯]

শিশু কিশোর সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার যে নিদারুণ ছবি প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের গল্পে তা সত্যিই বিরল। সামাজিক অবক্ষয়কে আড়াল করে, কেবল সুকোমল মনোবৃত্তির চর্চাই সেখানে মুখ্য ছিল। বিশ্বায়নের কালে বাস্তবকে আড়াল করবার কোনো প্রয়োজন গল্প লেখকেরা যুক্তি গ্রাহ্য মনে করেননি। গল্পের মধ্যে যে প্রতিবাদ রয়েছে তা যথেষ্ট সময়োপযোগী এবং লক্ষ করবার বিষয় সামাজিক এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভূতেরাই। তিন দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছে তারা -

''প্রথমত কোনো হেরিটেজ বিল্ডিং ভাঙা চলবে না। দ্বিতীয়ত নগর উন্নয়নের নামে গাছপালা কাটা ও জলাজমি ভরাট করা যাবে না। তৃতীয়ত সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।''[২০]

বিশ্বায়নের যে বহুমুখী প্রভাবের কথা আমাদের আলোচনায় বারবার প্রাসঙ্গিক হয়েছে, ভূতেদের এই বিদ্রোহ সেই প্রভাবের ফল স্বরূপ। প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করার পাশাপাশি 'সন্ত্রাস' এর ধারণা এই সময় পর্বে ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসের মধ্যে

ভয়ের যে ধারণা সেখানে তো এতদিন পর্যন্ত একছত্র অধিকার ছিল ভূতেদের। এর থেকেই অনুমান করা যায় ভূতেদের ভয় অপেক্ষা মানুষের সন্ত্রাস অনেক বেশি বীভৎস। তাদের তিন দফা দাবি আদায়ের জন্য পার্লামেন্টের আইন পাশ করতে হবে। সকল ভূতেরাই সমবেতভাবে এই বিপ্লব সফল করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রত্যেক মানুষের কাছে গিয়ে এক একজন ভূত তাদের তিন দফা কর্মসূচির কথা কানে কানে একশো আটবার ফিস্‌ফিস্‌ করে আসবে। ভূতেরা কৃতনিশ্চয় যে এতেই কাজ হবে।

> ''আমরা রাত বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে আমাদের এই তিনদফা কর্মসূচী ফিসফিস করে বলে যাবো। জনপ্রতি জনপ্রতি, পাল্টে দাও রীতি-নীতি। মানুষ আজকাল যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। খুব একটা যাচাই করে না।''[২১]

আমেরিকানদের বিরুদ্ধে অফ্রিকানরা যে সময় সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সেই সময়ের এটি খুবই জনপ্রিয় রাজনৈতিক নীতি ছিল। প্রতিজনের কাছে নিজের মতাদর্শ পৌঁছে দেওয়া। তবেই সংগঠিত সামাজিক বিপ্লব সম্ভব। ভূতেরাও মানুষের এই নীতির প্রয়োগ ঘটাচ্ছে মানুষেরই উপর। একবিংশ শতকের ভূতেদের আর একটি বিষয় লক্ষ করবার মতো, মানুষের উপরে প্রায়শই তাদের মতামত তৈরি হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মানুষের সমাজে ভূতেদের আনাগোনা ছিল। এখন সেই সরলরৈখিক গতায়াত আর নেই। মানুষরাও এসে পড়েছে ভূতেদের সমাজে। সেকারণেই মানুষের চোখে ভূতেদের বর্ণনা বা মতামতের আঙ্গিক পাল্টে গিয়ে ভূতেরাই মানুষদের সম্পর্কে নিজেদের মতামত তৈরি করছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, গোটা গল্প জুড়ে কোনো ভৌতিক আবহ নেই। রস বিচারে এই গল্পের স্থায়ীভাব উৎসাহ আর রস পরিণতি হলো বীর। সুতরাং ভূতের উপস্থিতি এখানে রূপক মাত্র। বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে যে সামাজিক অবক্ষয় তাকে স্পষ্ট করে তোলাই লেখকের আসল উদ্দেশ্য।

এই সময় পর্বের গল্পগুলিতে সামাজিক অপরাধ অন্যতম 'মোটিফ' হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। মৃত্যুর প্রসঙ্গ বা কোথাও কোথাও হত্যার প্রসঙ্গ বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী

গল্পগুলোতেও দেখা যায়। মৃত্যু ভৌতিক আবহ সৃষ্টির উপকরণ মাত্র। ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার প্রসঙ্গ অশরীরী আত্মার অতৃপ্ত বাসনার ইঙ্গিত হয়ে থেকেছে। সেই মৃত্যু বা হত্যার আড়ালে কোন সামাজিক অপরাধ উঁকি দেয়নি। বিশ্বায়ন পরবর্তী গল্পগুলিতে, আরও স্পষ্ট করে বললে ২০০০ সালের পরবর্তী গল্পগুলিতে, স্বাভাবিক মৃত্যু অপেক্ষা হত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছে। আর এই হত্যার পেছনে হয় রয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থ, নাহলে অপরাধ জগতের ইন্ধন। বিশ্বায়নের কালপর্বে গজিয়ে ওঠা 'হাইরাইজ' 'মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং' প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রোমোটিংরাজ চোখে পড়ার মতো। জমিকে কেন্দ্র করে বচসা এবং তারপরই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ - ফলশ্রুতি মৃত্যু। বিভীষিকাময় মৃত্যুর এই ছবি স্থান করে নিয়েছে শিশু-কিশোর গল্পে। কখনো শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ, কখনো বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কারণ যাই হোক না কেন পরিণতি মৃত্যু। আসলে ক্ষমতাবানের হাতে দুর্বলের পরাজয়। 'হাইটেক সিটি', 'গ্লোবালাইজেশন' এর অন্যথা ঘটাতে পারেনি।

ড. গৌরী দে এর 'ডিসেকশন রুমে' গল্পে কথক একজন ডাক্তার। পোস্টমর্টেম করবার জন্য এক মৃতদেহ আসলে তিনি লক্ষ করেন দেহটায় বুড়ো আঙুল কাটা। রাত্রে অশরীরী নিজে এসে সমস্ত বিবরণ বলে দিয়ে যায় কথককে। স্থানীয় দালাল জালাউদ্দিনের কারণেই দেহের আঙুলটি বাদ গেছে। ছায়াশরীর জানায় তার তাঁতকল ছিল, স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থায় জালাউদ্দিনের কাছে দশ হাজার টাকা ধার করে। পরবর্তীতে জালাল তার নিরক্ষরতার সুযোগ তার জমি জায়গা বাজেয়াপ্ত করে এবং নির্মমভাবে 'খুন' করে। চারপাশে বেড়ে চলা সন্ত্রাস এবং নির্মম হত্যার এই বাস্তব পরিবেশ কে এড়িয়ে কী বিশ্বায়নের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত আলোচনা সম্ভব? আর একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে নন্দ তাঁতির নিরক্ষতার দায় কি নেবে 'হাইটেক সোসাইটি'?

শংকরলাল সরকার - এর গল্প ‘রহস্যময় হাড়’ এ প্রোমোটিং ব্যবসার নৃশংসতার ছবি রয়েছে। গল্পের কথক সমরেশ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে জুনিয়র আর্কিওলজিস্টের পোস্টে চাকরি করেন। সম্প্রতি রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারে তাদের খননকার্য চলছে এবং সেখান থেকেই তিনি পেয়েছেন আশ্চর্য রহস্যময় হাড়। কাহিনির পরতে পরতে এর অভাবনীয় শক্তি টের পেয়েছেন সমরেশ। হাড়টিকে হাতে নিয়ে তিনি যা বাসনা করবেন সেটি পূর্ণ হবে। কিছুদিন আগেই পরেশবাবুকে ওরা বাড়ি ছাড়া করেছে। পাড়ার মস্তানদের ভয়ে লোকালয়ে বাস করা দায়। এদের সকলের মৃত্যু কামনা করেন তিনি। একদিন সন্ধ্যেবেলা আপন মনে হাডটিকে পর্যবেক্ষণ করছেন, এমন সময়ে -

> ‘‘পাড়ার কতগুলো মস্তান শীতলা না কী একটা পুজো উপলক্ষে প্রতিটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাঁদা তুলেছে। উপর থেকে মাঝে মাঝে ওদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। একটা লরির ড্রাইভারের সঙ্গে রীতিমতো মারামারি শুরু হয়ে গেল। আমি আর থাকতে পারলাম না, মনে মনে বলে উঠলাম, মর না, গাড়ি চাপাও তো পড়তে পারিস। পরের টাকা জোর করে আদায় করে ফূর্তি করিস, যত্তসব। বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লরি জোরে, বেরিয়ে গেল। প্রবল আর্তনাদ চিৎকার আর হইচই শুনে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, ছেলেটাকে রাস্তায় একেবারে পিষে দিয়েছে। স্পট ডেড।’’[২২]

একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ছে শিশু-কিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পে। প্রমোটিং এর স্বার্থে নিঃসহায় একজন বৃদ্ধকে অত্যাচার করতে মস্তানরা পিছপা হয়নি। পাশাপাশি এই পুজোর নামে চাঁদা তোলার হিড়িক, বর্তমান সময়ে মোটেই বিরল দৃশ্য নয়। যেখানে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে আধুনিক নাগরিক সমাজ যুক্তিবাদের কথা বলে সেখানে ধর্মের এই আস্ফালন কীভাবে সম্ভব? বিশ্বায়নের প্রভাব ও প্রবণতা বিচার করলে এর উত্তর পাওয়া সম্ভব হতে পারে। পাড়ার পুজো উপলক্ষে চাঁদা তুলছে পাড়ার ‘মস্তান’রা। কথক খুব নির্দিষ্ট করেই এদের শ্রেণি অবস্থান স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। সুতরাং এই পুজো অনুষ্ঠানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা ভক্তির সম্পর্ক নেই। রয়েছে ভয়ের। আর এই ভয়

দেবতা অপেক্ষা পাড়ার মস্তানদের প্রতিই বেশি তা নিঃসন্দহে বলা যায়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় দেবী শীতলা তার মহিমা হারিয়েছেন। সুতরাং দৈবী প্রকোপের ভয় অমূলক। আর সংগৃহীত অর্থ যে দেবীর সেবায় ব্যবহৃত হবে না তাও কথকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তাহলে চাঁদা সংগ্রহ করবার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি? নিঃসন্দেহে এটি একটি কারণ, কাঁচা টাকার প্রলোভনে ধর্মকে অস্ত্র করেছে এই মস্তানরা। এরা প্রকাশ্যে এসে টাকা সংগ্রহ করে বা সন্ত্রাস চালায় বলে আমরা এদের চিহ্নিত করতে পারি। তবে এরা যে বিচ্ছিন্ন এমন ভাবারও প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজের ছবি আমাদের সে কথা বলে না। এদের চেয়েও অনেক বড়ো ক্ষমতাবানের ছায়ার তলায় পুষ্ট এরা। সেইসব ক্ষমতাবানদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় বেড়ে চলে তাদের দৌরাত্ম। বাঙালির সমাজ ও মানসিকতাকে এরা খুব ভালো বুঝে নিয়েছে। উৎসবে মুখর বাঙালি আসলে নিশ্চিন্ততার ঘেরাটোপে নিজের গা বাঁচিয়ে চলে। নিরন্তর আমোদ ও উল্লাসের যোগান যদি থাকে তাহলে তার আড়ালে সামাজিক শোষণ নিশ্চিন্তে চলতে পারে। নিরাপদে ঘটতে পারে সামাজিক অবিচার। ঘটনার উত্তাপ যতক্ষণ না গায়ে এসে লাগছে ততক্ষন নির্বিবাদে, নিশ্চিন্তে বাঙালি জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। গল্পে এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের প্রতি তীব্র সমালোচনা রয়েছে।

> ‘‘টিভিতে একদিন এক জঙ্গিকে দেখাচ্ছিল, বহু নিরীহ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। হাড়টা হাতে নিয়ে ওর মৃত্যু কামনা করছিলাম।’’[২৩]

ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বিশ্বের স্থানিক দূরত্ব কমিয়েছে। দেশ বিদেশের খবর মুহূর্তেই হাতের মুঠোয় চলে আসে, কিন্তু জঙ্গিহানার যে ছবি উপরের উদ্ধৃতাংশে রয়েছে সমবেতভাবে সেখানে সামাজিক প্রতিবাদ তৈরি হয় কি? যতক্ষণ না সেই বিপদের আগুন আমাদের নিজেদের দগ্ধ করছে? বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আমরা কি ক্রমশই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি না? ঘটনার উত্তাপ শিথিল হলে পুনরায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছি আমোদে উৎসবে। গল্পে সোমনাথ নিজের প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর জোরালো করেছে। রহস্যময় হাড় নিয়ে সে মৃত্যু কামনা করেছে।

অসহায় মানুষ প্রতিবাদী হওয়ার জন্য অলৌকিকতাকে আশ্রয় করছে। বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে অতিলৌকিক ক্ষমতায় - এপর্যন্ত কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু হিংসার উত্তর - হিংসাই হবে কেন? রহস্যময় হাড় দিয়ে তো শান্তি প্রতিস্থাপনের কথা ভাবে নি সমরেশ। নাকি মৃত্যুর জবাব কেবল মৃত্যুই, হিংসার বিপরীতে কেবল হিংসাই থাকতে পারে? বিচ্ছিন্নতা, আত্মপ্রীতি আমাদের এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ করেছে যে চারপাশে হিংসার পরিবেশে বিকল্প হয়ে উঠেছে একমাত্র হিংসা, একমাত্র মৃত্যু।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প 'কালো ছড়ি'তে চোরাকারবারি অর্থাৎ 'স্মাগলিং'কে কেন্দ্র করে 'খুন' এর প্রসঙ্গ রয়েছে। মুরারীবাবু প্রতিদিনের মতো মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন। পার্কে যে বেঞ্চে তিনি বসেছিলেন সেখানে আদ্দির পাঞ্জাবী পরা একজন ভদ্রলোক এসে বসলেন। একটি সিগারেট ধরিয়ে শেষ করে নিজের কালো ছড়িটা ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন। মুরারীবাবু তার পেছন পেছন ছড়িটা নিয়ে গেলেও অবিলম্বেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ছড়িটা নিজের কাছেই রাখবার সিদ্ধান্ত নেন মুরারীবাবু, পরে ভদ্রলোকের সন্ধান পেলে তাকে দিয়ে দেবেন। এরপর থেকেই ছড়িটাকে ঘিরে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রতি রাত্রে ছড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সকাল বেলায় যথাস্থানে ফিরে আসে। অদ্ভুতুড়ে এই ঘটনায় মানসিক অস্বস্তিতে ভোগেন মুরারীবাবু। অবশেষে ছড়িটা পুলিশের কাছে জমা দেবেন বলে মনস্থির করেন। পুলিশের কাছে যাওয়ার পর ছড়ির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে হীরে। তদন্তের পর জানা যায় ছড়িটা সুশীল কুমার আঢ্য নামে এক ব্যক্তির। বংশের সম্পদ আগলে রেখেছিলেন তিনি। আর সেকারণেই বেচুলালদের হাতে 'মার্ডার' হতে হয়। যদিও হীরে পাচার সম্ভব হয়নি অশরীরী সুশীলবাবুর জন্য। থানা থেকে বেরিয়ে মুরারিবাবু ভাবলেন -

> ''আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পুলিশের আইনে ভূত প্রেত বলে কিছু নেই। তাছাড়া আসল ঘটনা খুলে বলতে গিয়ে নিজেই হয়তো এই খুনের কেসে জড়িয়ে পড়বেন। পুলিশ ভূত প্রেতের চেয়ে সাংঘাতিক। তার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়াই নিরাপদ।''[২৪]

নিশ্চিন্ত নিরাপদে গা বাঁচিয়ে চলা একবিংশ শতকের মানসিকতা। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এই টানাপোড়েন মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। সমস্ত ঘটনা বিশদে বলবার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়াই শ্রেয় বলে মনে হয়।

সামজিক অবক্ষয়ের এই দিনে ভূতেরা কিন্তু মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সমালোচনা যেমন করছে, তেমনি বিশ্বাস করতেও দ্বিধা করেনি।

> ''তবে হ্যাঁ। একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সুশীলবাবুর আত্মা যেন ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। মুরারীবাবুর মতো ভালো মানুষ শেষ অব্দি তাঁর ছড়িটা থানাতে জমা না দিয়ে পারবেন না। তাই ছড়িটা ওইভাবে বেঞ্চে তাঁর কাছে ফেলে রেখে সুশীলবাবুর আত্মা উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।''[২৫]

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের ধারণা একমুখী নয়। শ্রেণি সচেতনতা এবং অথনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এই সময় পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - যা শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পে স্থান পেয়েছে। অপরাধ জগতের ছবি এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্ন ধরা পড়ে এই গল্পগুলোতে। শিশু-কিশোরদের সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন যেমন ঘটেছে শপিংমল, ইন্টারনেট এর মাধ্যমে, তেমনি ভূতেরাও বিশ্বায়িত হয়েছে। তারাও কুসংস্কার মুক্ত। সেকারণে দিনের বেলাতেও আনাগোনা বেড়েছে তাদের। রাম নামে আর আত্মগোপন করবার প্রয়োজন হয় না তাদের। শ্যাওড়া গাছের 'মাম্‌দো ভূত' বা 'হানাবাড়ির সাহেব' বা 'জমিদার ভূতের' পর্ব মিটে গিয়ে ভূতেরা জায়গা করে নিয়েছে একেবারে ফ্ল্যাট বাড়ির ড্রয়িং রুমে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় আর আড়াল প্রয়োজন নেই তাদের। আবার বিশ্বায়িত সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে তারা। কখনো বা সংঘবদ্ধ অন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এক কথায় এই সময় পর্বে মানুষ যত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে চারদেওয়ালে নিজেকে আটকে রেখেছে। ভূতেরা ততই বেশি মুক্তমনা হয়েছে, মানবিক হয়েছে।

(আ) মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ঃ

বিশ্বায়ন পরবর্তী শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত আলোচনার আগে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত লক্ষণীয়, কার বা কাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ? লেখকরা তাদের গল্পে শিশু-কিশোরদের যে গল্পজগত তুলে ধরেছেন, সেই আখ্যান ভাগকে নির্ভর করে সমসাময়িক প্রেক্ষিতে শিশু কিশোরদের মনস্তত্ত্বকে বুঝতে চাইবো, সেক্ষেত্রে লেখক বা কথকের কোনো বিশেষ অভিপ্রায় যদি পরিক্ষলিত হয়, সেটিও প্রসঙ্গ সূত্রে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় পত্রিকার গল্পের পাঠক আসলে কোন শিশু-কিশোররা? অর্থাৎ তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান কী? এই অবস্থানকে স্পষ্ট করতে না পারলে মনস্তত্ত্বের আলোচনা ভীষণ একমুখী ও সরলরৈখিক হয়ে পড়বে। বর্তমানে এই দুটি পত্রিকার মূল্য কুড়ি টাকার কম নয়। শারদীয়া বা বিশেষ সংখ্যা হলে তার দাম আরও বেশি। 'আনন্দমেলা' এবং 'কিশোর ভারতীর' মাসে দুটো করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুতরাং আর্থিক পরিস্থিতির কথা বিচার করলে পশ্চিমবঙ্গের সব বাংলাভাষী শিশু-কিশোরের কাছে এই পত্রিকা সমানভাবে পৌঁছায় এবং সমান আবেদন তৈরি করে, একথা অবিশ্বাস্য। সাধারণ গ্রন্থাগারে এই পত্রিকাগুলোর সংকলন রাখা হয় বটে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে সমাজের সব স্তরের শিশু-কিশোরকে নিজেদের পাঠক করে তুলতে পত্রিকাগুলো অপারগ। কৈশোরবেলা যাপনের জন্য এবং কল্পনার বিলাস করবার জন্য যে সময় এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন, ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে সব শ্রেণির সে ক্ষমতা নেই। নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের কাছে শ্রেণিবৈষম্য এতটাই প্রবল যে কল্পনার বিলাসিতা করবার সুযোগ তাদের নেই। বিশ্বায়নের হাত ধরে মানুষ যতই আধুনিক হোক না কেন, প্রদীপের আলোর নিচে অন্ধকারের মতো জমাট বেঁধে থাকা এই সামাজিক ক্ষতকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অতএব নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুকিশোররা এই পত্রিকার উদ্দিষ্ট পাঠক নয়। আমাদের প্রতিপাদ্য এই নয় যে, পত্রিকাগুলোতে মুখবন্ধের মতো বলা থাকে যে নিম্নবিত্তের শিশু-কিশোর এই পত্রিকার পাঠক নয়, বরং যে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে তারা সরাসরি পাঠক হয়ে উঠতে

পারছে না, বিশ্বায়নের বহুমুখী প্রভাব হিসাবে আমরা সেই কারণগুলোকে স্পষ্ট করতে চাই। সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুকরণের মধ্যেই আসলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে উচ্চ বা মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের মানসিকতা। তারাই এই গল্পগুলোর মুখ্য পাঠক বা শ্রোতা।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'অদৃশ্যের মন্ত্রণা' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র পবন মনস্থির করে সে আত্মহত্যা করবে। জীবনে সবদিক থেকে এতটাই ব্যর্থ যে, আত্মহত্যা ছাড়া তার কাছে দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই। ক্লাস সিক্সের গন্ডি না পেরোতেই বাবা মারা যান পবনের, মা চরম আর্থিক কষ্টে মানুষ করেছিল তাকে। সামান্য মাইনের কাজও জোগাড় করেছিল পবন। মায়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ করেছিল। হঠাৎই কাজটা বন্ধ হয়ে গেল। মাস ছয় যেতে না যেতেই পবনের পুঁজি এলো ফুরিয়ে। পবনের ছেলের তখন হামা দেওয়ার বয়স। মহাজনের কাছে ঋণ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। পবনের স্ত্রী তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পবনের প্রতিবাদ করার কোনো ক্ষমতাই রইলো না। কেবলমাত্র সন্তানের জন্য তার মন ভার হয়ে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে সে গুম হয়ে বসে রইলো।

> ''পবন সারাদিন ঘরেও টিকতে পারত না। ছেলেটার কথা মনে পড়তো সারাক্ষণ। শিশু গরীব-বড়লোক বোঝে না। সে তার বাবাকে চিনতো খুব, দেখলেই ঝাঁপিয়ে আসতে চাইতো কোলে। বেড়াতে যাবে।''[২৬]

শিশু গরীব - বড়লোক বোঝেনা, আবার শিশু-কিশোর পাঠ্য গল্পেই পবনের যন্ত্রণার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিশুমন নিরাপত্তা চায়, সেই মানসিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আর্থিক সামর্থ্য চাই। বেকার পবনের ইচ্ছে থাকলেও নিজের সন্তানকে কাছে রাখার ক্ষমতা তার নেই। পরিস্থিতির কাছে সে নিদারুণ অসহায়। যাদের কাছে বিপদের দিনে সহযোগিতা প্রত্যাশা করে মানুষ, তারাই যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন জীবনের কোনো সার্থকতাই থাকে না।

''থাকতে না পেরে পবন একদিন ছেলে বউকে আনতে গেলো। বউ সীমা সে বাড়ীর চৌকাঠই ডিঙোতে দিল না। বলল, ''গরিবগুর্বো জামাইও এক বাক্স মিষ্টি অন্তত নিয়ে আসে, তুমি তো দাড়িটাই কেটে আসোনি। দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সীমা। পবনের মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব দরজাই তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ একা লাগল নিজেকে।''[২৭]

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার বাজারে বেকারত্ব এক জ্বলন্ত সমস্যা, লক্ষ করবার বিষয় পবনের বেকার জীবনের যন্ত্রণা স্থান পাচ্ছে শিশু-কিশোর সাহিত্যে। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর যে আসলে মানুষের সম্পর্ক নির্ভর করছে, এই ধারণা বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে সম্পর্কের আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কেবলমাত্র চাওয়া পাওয়া এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে উঠেছে। শিশু কিশোররাও বুঝতে শিখছে সম্পর্কের ভালোমন্দ নির্ভর করছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উপর। মানসিক নির্ভরতার কোনো দাম সেখানে নেই। সেকারণে সহপাঠীর কম্পিউটার রয়েছে বলে তাদের কম্পিউটার চাই। বন্ধুর দামী মোবাইল ফোন রয়েছে আর তার কেন নেই এই অভিযোগে তারা অভিযুক্ত করেছে অভিভাবকদের। পবনের একাকীত্ব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, চাওয়া পাওয়ার হিসেবে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা গেলেই অভিযোগের তালিকা বাড়তে থাকে। পারস্পরিক নির্ভরতার পরিবর্তে নিজের 'না-পাওয়া' মুখ্য হয়ে ওঠে। 'আমি'র বোধ যদি প্রবল হয় সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য পরিণাম হয়ে দাঁড়ায়। বিচ্ছিন্নতার বোধ বিশ্বায়ন পরবর্তী কিশোরদের একা ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পবনের জীবনের দায়ভার গ্রহণ করে না, বাধ্য করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে, সেই সময়পর্বে দাড়িয়ে ভাবী প্রজন্মের এই কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের নিরাপদ ভাববে কী করে? ফলস্বরূপ হতাশা একাকীত্ব তাদের মনের অন্ধকারকে জমাট বেঁধে তোলে। এই অন্ধকারেই তারা প্রত্যক্ষ করে বিশ্বায়নের ভূতকে।

সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত আলোচনার সময় বিশ্বায়নের বিচ্ছিন্নতাবিরোধী যে কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই গল্পেও তার উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। পবন যখন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় সেই সময়ে অশরীরী ভূত এসে তাকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনে। সেখানে ভূতের ভূমিকা প্রায় দার্শনিকের মতো। পবনকে সে বেঁচে থাকার মানে তৈরি করে দেয়। স্বার্থপরের মতো বেঁচে থাকার পরিবর্তে অন্যের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেওয়ায় যে আনন্দ, পবন তা উপভোগ করে ভূতদাদার পরামর্শে।

> ''ভূতদাদার কথা মতো সবই করল পবন। উদয়পুর স্টেশনে ওভার ব্রিজ নেই। মাল কাঁধে নিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে ধরে ধরে রেললাইন পার করাল। রিকশায় উঠে বৃদ্ধ, ''বাবা, দীর্ঘজীবী হও।'' বলে আশীর্বাদ করলেন।''[২৮]

> ''আকাশের দিকে তাকাল পবন। একটা দুটো করে তারা ফুটছে। সুরু ফালির মতো চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষ চলছে।''[২৯]

বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেমন সংকটের মুখে, তেমনি বহুতল বাড়িতে বাস করে মাটির সঙ্গেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। প্রকৃতি তার জগতে জীবন ধারণের যে উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে তা উপেক্ষা করে মানুষ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ। জীবনকে নির্বিচারে শেষ করে দেওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, বরং জীবনের প্রতিকূলতাকে জয় করে জীবনের সঠিক মূল্যবোধ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। ভূতদাদার কথা শুনে পবন ফিরেছে জীবনের পথে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তারই মতো দুঃখী মানুষদের দিকে। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে মানবিক গুণগুলো বিলুপ্ত প্রায়। সেকারণে গল্পে বারবার ফিরে ফিরে আসে মানবিক অনুভূতির প্রসঙ্গ।

> ''ভূতদাদার কথা ভাবতে ভাবতে চোখ গেল রেল লাইনের ধারের কোনটায়। কী ব্যাপার, গাছগুলো দুলছে কেন? হাওয়া নেই, ট্রেনও যায়নি, সন্দেহ দূর করতে ঢাল বেয়ে ঝোপটার কাছে উঠে এলো পবন। এ কী! একটা লোক হাঁটু মুড়ে

লাইনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। দূরের বাঁকে ট্রেনের আবছা হেডলাইট। লোকটির দিকে তাকিয়ে পবন বলল, 'কাণ্ডটা কি আজ না করলেই নয়?' চমকে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। পবন এগিয়ে দুঃখী মানুষটার কাঁধে হাত রাখল!''[৩০]

একবিংশ শতাব্দীর সময়পর্বে এসে যৌথ পরিবারের ধারণা ভেঙে 'নিউক্লিয়ার' পরিবার তৈরি হল। আত্মীয় পরিজন বিমুখ হয়ে শিশু-কিশোররা দিনের অধিকাশ সময় অতিবাহিত করে সেন্টার থেকে মাইনে করা পরিচারিকাদের কাছে। নিঃসঙ্গতার এই বোধ শিশু কিশোরদের নিরাপত্তাহীন করে তুলল। চারপাশে এত মানুষের ভীড়েও তারা একা এবং বিচ্ছিন্ন। কারোর সঙ্গেই আত্মিক যোগ তৈরি হল না তাদের। এই একাকীত্ব এবং নিরাপত্তাহীনতাকে ঘিরে দানা বাঁধতে থাকলো অবিশ্বাস। সেকারণে প্রত্যেকের থেকে নিরাপদ দূরত্বে তারা তৈরি করল নিজেদের নিজস্ব জগত। যার হদিস তারা কোনো ভাবেই বড়দের দিতে নারাজ। ভূতেরা এই নিঃসঙ্গতার সুযোগে ভাব জমিয়েছে শিশু কিশোরদের সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রেই গল্পে ভূতেদের উপস্থিতি কিশোরদের কাছে মোটেই ভৌতিক মনে হয়নি। মানুষের বেশেই ধরা দিয়েছে অশরীরীরা। আর যেখানে ভূতেদের সরাসরি অবতরণ সেখানে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের তর্ক অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী কালে শিশু-কিশোরদের ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবার জন্য কোনো যুক্তি প্রতিযুক্তির প্রয়োজন হতো না। সরল মনেই তারা ভূতেদের উপস্থিতি স্বীকার করে নিত। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রসারের ফলে সরাসরি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা আর সম্ভব হল না। অথচ এতদিনের সংস্কারকে সে একেবারে মুছে ফেলতে পারল না। সেকারণে যুক্তি দিয়ে সে যেমন ভূতের অস্তিত্ব নাকচ করতে চাইল, পাশাপাশি ভিতরে জমে থাকা অন্ধকার তাকে বিশ্বায়িত ভূতেদের মুখোমুখি করে তুলল। বাইরের আলো সেই অবাধ গতায়াতে মোট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। প্রচেত গুপ্ত ''দিনের বেলাতেও ভূত দেখা যায়'' গল্পে শিশু-কিশোরদের মানসিকতার ছবিটি স্পষ্ট করে তুলেছেন।

''সন্তোষ খাওয়া থামিয়ে বলল, ''আচ্ছা বলাই দা শহরে ভূত আছে? বলাই সামন্ত চোখ বড় বড় করে বললেন, ''আলবাৎ আছে, একশোবার আছে।''

সন্তোষ বলল, ''সেকি! শহরে তো খুব আলো। সেখানে ভূত থাকবে কী করে?
বলাই সামন্ত মুচকি হেসে বললেন, ''আলোতে ভূত থাকে না তোকে কে বলল?''
সন্তোষ চোখ বড় বড় করে বলল, ''সেই ছোটবেলা থেকেই তো শুনে আসছি, ভূত কেবল রাতে বের হয়। যত ভূতের ভয় সে কেবল রাতেই।
বলাই সামন্ত বললেন, ''তোর মাথা। দাঁড়া খাওয়াটা শেষ করে দিনে দেখা ভূতের গল্প বলছি।''[৩১]

কিশোররাও গ্রাম এবং শহরের অবস্থান ভেদ নিয়ে মন্তব্য করছে। গ্রামকে এইভাবে চিনতে শেখা আসলে আধুনিক শহুরে মানসিকতা। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস্যের যে দ্বন্দ্ব তাও উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট। আধুনিক শহুরে মন ভৌতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। অথচ দীর্ঘদিনের সংস্কার বারবার বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে ভূত আছে।

বিশ্বায়নের প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশে যে সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে তার প্রমাণ মেলে বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্পে। 'ইন্টারনেট',' 'হাইরাইজ', 'মাল্টিপ্লেক্স'- নিয়ে আধুনিকতার পাশাপাশি শ্রেণি বৈষম্যের ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলেছে বিশ্বায়ন। বেকারত্ব, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব, বেসরকারীকরণ এগুলোকে বাদ দিয়ে বিশ্বায়নের ধারণা অসম্পূর্ণ। অধুনিকতা ও সামাজিক সংস্কারের যে টানাপোড়েন তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নের কালপর্বে। অন্ধকারের মোটিফ অন্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই সময়ে। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পে এই অন্ধকার ছিল বাইরের, বর্তমানে অন্ধকার মানুষের ভেতরের। বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস, ব্যক্তিস্বার্থ এসব মিলে ক্রমেই সে অন্ধকার জমাট বেধে উঠছে, আর সেই অন্ধকারেই বিশ্বায়নের ভূতেদের আনাগোনা। সেকারণে ভূতেদের শরীরী উপস্থিতির আর প্রয়োজন পড়ল না। শাকচুন্নী, ব্রহ্মদৈত্যি, পেত্নী, মামদোভূত এরা সকলেই অবয়ব ছেড়ে ছায়াময় হয়ে উঠলো। মানুষের মনে হানা দিয়ে এরা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করল। কিন্তু কেমন সে অস্তিত্ব? 'থাকা' এবং না-থাকার মাঝের যে সংশয়, সেই সংশয়কে অবলম্বন করে এরা একধরণের 'অস্বস্তি'র তৈরি করলো যাতে মানুষের অস্তিত্ব ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়লো। স্পষ্টত, এই সংশয়,

দোলাচল, প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তা কি বিশ্বায়ন পরবর্তী সমাজের বাস্তব চিত্র নয়? আদর্শগতভাবে 'বিশ্বায়ন' আর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন এই দুই এর অসাম্য সামগ্রিক মানসিক পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয় শিশু কিশোরদের মধ্যেও। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে ভূতেদের শ্রেণি চরিত্র যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো ভূত এদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গও ছিল যথেষ্ট প্রবল। বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে মানুষের মধ্যেই বিভাজনের রাজনীতি এত তীব্র হয়ে উঠল যে ভূতেরা বিভাজন মুছে ফেলে, শরীরটুকু বাদ দিয়ে কেবল ছায়াটুকু আশ্রয় করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনের মতো সরলরৈখিক জীবন আধুনিক কালপর্বে এসে আর রইল না। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী কালে গল্পে এদের শরীরী উপস্থিতি আসলে পূর্ব সংস্কার জাত, একবিংশ শতাব্দীতে মানসিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলালো ভূতেদের ধরণ।

নীলনাথ দাসের গল্প 'সেই সন্ধ্যায়' ভূতের শরীরী উপস্থিতির বদলে এসেছে ছায়াশরীর। গল্পের কথক একা বাড়িতে চৌকাঠ থেকে রান্নাঘরে যাওয়ার পথে লক্ষ করে তার পরিচিত লুকাস চাচা সেখানে দাঁড়িয়ে। বাইরে আজ অমাবস্যা, 'আন্ধার' যেন তাই বেশি। লুকাস চাচাকে দেখার আগে পর্যন্ত এই অন্ধকারকেই ভয় পাচ্ছিলেন কথক, অন্ধকারে স্পষ্ট চিনতে না পারলেও গলা শুনেই বুঝতে পেরেছেন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়া মূর্তি চাচা ছাড়া আর কেউ নয়।

> ''উঠোনে নেমে এদিক ওদিক দেখে ধীরে ধীরে যাচ্ছি, শুনলাম কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে দেখি আমাদের বাড়ির মাঝখানের দরজায় লুকাস চাচা দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারেও চিনতে কোনো অসুবিধে হয়নি। বাঁচলাম যেন আমি। চাচা বলল, ''ডর লাগছে''? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম ''লাগবে না তো কি? আজ অন্ধকার একটু বেশিই!'' চাচা উত্তর দিল, ''অমাবস্যা চলছে ছোটুয়া, তাই এত আন্ধার!''[৩২]

ভূতের ভয় থেকে উদ্ধার করবার জন্য ভূত এসে হাজির হয়েছে। অন্ধকারময় পরিবেশে যে ভৌতিক আবহ তৈরি হয়েছে তার ফলে সংস্কার বশত কথকের মনে ভয় তৈরি

হয়েছে। এই ভয় আসলে যতটা ভূতের তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তাহীনতার। এই সংকটের সময়ে ভূতেরা সঙ্গী হয়েছে মানুষের।

চাচার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, এসময়ে কোনোদিনই তো চাচা আসে না, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ঝিমোয়। তাহলে কী অন্য কোন কাজে এসেছে?

আপাত ভাবে ভূতের ভয় যখন আর রইল না, ঠিক সেই সময় কিশোর মন যুক্তিবাদী হয়ে উঠল। চাচার হঠাৎ আসার কারণ অনুসন্ধান করতে সে তৎপর হয়ে উঠল। ক্রমাগত এই সংশয় এবং যুক্তির মধ্যে দিয়ে বিশ্বায়ন পরবর্তী গল্পগুলো আখ্যান নির্মাণ করেছে, সব শেষে ঘটনার আকস্মিকতায় সে বিস্মিত হয়েছে। বারেবারে অস্তিত্বের এই সংকটের কথা ভূতের গল্পগুলোতে স্পষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের এই দোলাচল বিশ্বায়ন পরবর্তী শিশু-কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ 'মোটিফ' হিসাবে দেখা দিয়েছে।

অনীশদেব তার সম্পাদিত ''সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক'' বইয়ের প্রচ্ছদ পত্রে এই সংশয়ের ইঙ্গিত রাখছেন।

> ''এই বইয়ের গল্পগুলো পড়তে পড়তে হঠাৎই পিছন থেকে 'খুট-খাট' শব্দ শুনতে পেলেন। না, আপনার পিছনে ফিরে তাকানোর দরকার নেই। কারণ, এই হালকা শব্দটা নেংটি ইঁদুরের কাণ্ড হতে পারে, কিন্তু একটু পরে আপনি যখন খুব দীর্ঘায়িত 'ক্যাঁ-চ', 'ক্যাঁ-চ', শব্দ শুনতে পেলেন, দুবার, তখন কী আপনি ভয় পেয়ে পিছনে ফিরে তাকাবেন? আমার পরামর্শ হলো, তাকাবেন না, ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার? কারণ, যদি তাকান, তাহলে হয়তো দেখবেন ঘরের ভেজিয়ে রাখা পাল্লা দুটো খুব ধীরে খুলে যাচ্ছে। এটা হয়তো বাতাসের কারসাজি। কত রকম বাতাস যে বয়। এরপর পাল্লা দুটো আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। ওদের একই রকম মিহি আর্তনাদ শোনা গেল দ্বিতীয়বার। তারপর সব চুপচাপ।''[৩৩]

সংশয় এবং বিশ্বাসের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী বাংলা ভূতের গল্প। শিশু-কিশোরদের গল্পেও এই অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ন'এর দশকের পর থেকে। 'ভালো ভূত' আর 'খারাপ ভূত' এই ধারণার বৈপরীত্যে গল্পগুলির বিচার একমাত্রিক হয়ে পড়ল। কারণ সমাজটাও কেবলমাত্র ভালো খারাপের বৈপরীত্যে দাঁড়িয়ে নেই আর। সর্বোপরি 'কে ভালো' 'আর কে খারাপ' খুব সহজে এর মীমাংসা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। প্রতিযোগিতার বাজারে 'ভালো' এবং 'খারাপ' এই দুটো ধারণাই আপেক্ষিক। আখ্যানের দিক থেকে দেখলে 'ভালো ভূত' এবং 'খারাপ ভূত' এই নির্বাচনের জন্যও স্থানিক দূরত্ব প্রয়োজন। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ে এই দূরত্বই আসলে ভূতেদের চরিত্র নির্মাণ করত। এবং মোটের উপর মানুষের নির্ধারিত মানদণ্ডে এই বিশ্লেষণ চলত। বিশ্বায়নের কালপর্বে বাইরে আলো যত বাড়ল, মানুষ যত আধুনিক হল, ভূতেদের সঙ্গে স্থানিক দূরত্ব ততই কমে এল। কেবলমাত্র বাইরে থেকে ঘটনার নিরিখে ভালো মন্দ বিচারের উপায় রইল না। একবিংশ শতকের ভূতেরা জায়গা করে মানুষেরই সমাজে। তাদের মনের অন্ধকার নিয়ে তাদের কারবার বাইরের এত আলোকে ভূতেরা মোটে পাত্তা দেয় না।

মানুষের মনের এই অন্ধকারময় দিকগুলোর সন্ধান করলে দেখা যাবে ভূতের গল্পে যেমন এসেছে কিশোরদের নিরাপত্তাহীনতার আখ্যান, তেমনি এসেছে অপরাধ প্রবণতা এবং মৃত্যুর 'মোটিফ'। সরাসরি তারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমনটা নয়, কিন্তু হয় তারা অপরাধের স্বীকার হচ্ছে, না হয় সামাজিক এই অবক্ষয়ের সাক্ষী হিসাবে নিজেদের অবস্থানকে চিহ্নিত করছে। সম্প্রতি খবরের কাগজ, মিডিয়ার দৌলতে সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুই তাদের অগোচরে থাকছে না, সে কারণে গল্পের আখ্যানেও সামাজিক সংকটের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিপুল মজুমদারের গল্প 'মুক্তিদাতা' গল্পে অনুপম, পাহাড়ের মস্তানদের আস্তানায় বন্দী। মুক্তিপণ হিসাবে দলের মাথা অনুপমের বাবার কাছে তিনলাখ টাকা মুক্তিপণ

দাবি করেছে। ক্লাস নাইনের ছাত্র অনুপম জানে তার বাবার অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। বন্দী দশায় আতঙ্কে দিন কাটে তার। মোহন সেই অপহরণকারীদের দলের লোক আর তার উপরেই অনুপমের দায়িত্ব। একমাত্র মোহনের সঙ্গেই সহজ হতে পেরেছিল অনুপম। তাকে জানিয়েছিল বাবার আর্থিক সামর্থের কথা।

> ''তিন লাখ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার বাবার নেই। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে, জমিজমা বেচে, বন্ধুবান্ধবদের থেকে ধার দেনা করে অনেক কষ্টে বাসটা কিনেছেন বাবা। প্রতি মাসে যা আয় হয় তার বেশির ভাগটাই ধার শোধ করতে বেরিয়ে যায়। যতদূর জানি হাজার বিশেকের বেশি একটা টাকাও বাবার ব্যাঙ্কে নেই। অতগুলো টাকা উনি পাবেন কোথায়!''[৩৪]

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের গল্পে অপহরণের ছবি তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অনুপমের বন্দীদশার আতঙ্কের পাশাপাশি লক্ষ করবার বিষয় যে সে তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত সঞ্চয় রয়েছে তা অনুপমের অজানা নয়। বাস্তবকে ভুলে কেবল কল্পনার বিলাস একবিংশ শতকের কিশোরদের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় আছড়ে পড়া দেশ বিদেশের সন্ত্রাসের খবর তাদেরকেও সচেতন করে তুলেছে।

অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে মায়ের কথা মনে পড়ে অনুপমের। মা বারবার করে সচেতন করে দিতেন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে -

> ''মা প্রায়ই শেখাতেন অচেনা মানুষ জনের সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। তাদের দেওয়া কোনো খাবার খাবে না। তাদের সঙ্গে হুটহাট কোথাও যাবে না।''[৩৫]

যে সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিভাবকেরা বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করছেন, সেই পরিস্থিতিও কি বিচ্ছিন্নতার কারণ নয়? অচেনা মানুষের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে এই সত্য জানবার পরে একুশ শতকের ছেলেমেয়েদের পক্ষে নির্বিবাদে নিজেদের

বিশ্বাসকে অচল রাখা সম্ভব? প্রতিমুহূর্তে সন্দেহ এবং সংশয় কি তাদের মননকে আচ্ছন্ন করছে না? আসলে আচ্ছন্ন যে করছে তার প্রমাণ গল্পে রয়েছে। অপহরনকারীদের প্রকৃত পরিচয় না জেনে গাড়িতে উঠেছিল বলেই তো তার এই পরিণতি।

অনুপমকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের দলের লোকের কাছেই প্রাণ হারাতে হয় মোহনকে। নির্মম সে মৃত্যু। মানবিকতার সামান্য লেশটুকু নেই তাদের আচরণে। আকস্মিকতায় হতবাক অনুপম ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দেখল মোহন এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রের কাছে। তারপর অনুপমকে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং কিছু দূর এগিয়ে যে পুলিশ ফাঁড়ি সেখানে অপহরণকারীদের সংবাদ জানাতে বলে মোহন।

> ''মুহূর্তে কুয়াশার আড়ালে মিশে থাকা কায়াহীন মোহন ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে উঠলো, ''ওরা টের পেয়ে গেছে খোকাবাবু!'' আর হাঁটলে হবে না। এবার তুমি ছুটতে শুরু করো, ভয় নেই আমি তোমার সঙ্গে আছি।''[৩৬]

মানুষের মূল্যবোধের কতটা অবক্ষয়ের ঘটলে একটা তরতাজা প্রাণ মুনাফা আদায়ের মাধ্যম হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হত্যা করতেও তারা পিছুপা হয় না। সেই সময় ভূতেদের কাছ থেকে সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে। মানুষের কীর্তিকলাপে তারাও হতবাক্। বিশ্বায়নের যুগে একে আমরা পাল্টা সমালোচনা হিসাবে পড়তে চাই। কৈশোরে যে মানসিক নিরাপত্তা তারা আশা করে বর্তমান সমাজ তা দিতে অপারগ। সেই সময়, ''ভয় নেই আমি তোমার সঙ্গে আছি'' এর মতো সংলাপ মনে সাহস বাড়িয়ে তোলে। গল্প কথায় ভূতেরা তখন কেবল অতীত হয়ে থাকে না। তারাই হয়ে ওঠে বর্তমান বা বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচক।

ভূতের গল্পে অপরাধ জগতের যে ছবি রয়েছে, তা দুটি মানসিক দিককে স্পষ্ট করে তোলে, এক প্রতিহিংসা, দুই আত্মগ্লানি। বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্পে প্রতিহিংসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ। জীবৎকালে অত্যাচারিত মানুষ মৃত্যুর পর ফিরে আসে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য। হিংসার বিকল্প, বর্তমান সমাজে পাল্টা হিংসা। শিশু কিশোরদের মানসিকতার উপর প্রতিহিংসার ছবি গভীর প্রভাব তৈরি করে।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তর গল্প 'রক্ত চোষা'-তে ধনঞ্জয় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্তের স্যাম্পেল জোগাড় করে তা পরীক্ষা করত। সেই জায়গায় সম্প্রতি নকুলবাবু নতুন প্যাথলজি সেন্টার খুলেছেন। রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য সেখানে এত বেশি টাকা ধার্য করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ এখনো ধনঞ্জয়ের কাছে রক্তপরীক্ষা করায়। এতে নকুলবাবুর ব্যবসা লাভের মুখ দেখে না। পাড়ার মস্তান বটুকের সঙ্গে পরামর্শ করে নকুলবাবু ধনঞ্জয়কে হত্যা করেন। মৃত্যুর পরে সে ফিরে আসে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে। মানুষ হিসাবে সে প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়নি। মৃত্যু পরবর্তী ভূতদশায় সে তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করেছে।

> ''কী আমাকে চিনতে পারছেন? আমি তোমাদের সেই রক্তচোষা। আর এক রক্তচোষার রক্ত চুষব এখন'। এই বলে লোকটা অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। হাঁ করে প্রথমে সে জিভ বার করল। তারপর দুহাত দিয়ে দুপাশে তুলে ধরা সিরিঞ্জ দুটো তে চাপ দিতেই সিরিঞ্জ থেকে রক্ত গিয়ে পড়তে লাগল তার জিভে। লোকটা খেতে লাগল সেই রক্ত। বীভৎস সে দৃশ্য।''[৩৭]

সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেই রক্তচোষা ধনঞ্জয়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিহিংসা। যে বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা এই গল্পে রয়েছে; বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে এই ছবি তেমন চোখে পড়ে না। এই দৃশ্য থেকে বর্তমান সময়ে কিশোরদের মানসিক অবস্থানটিকে বুঝে নেব। বিশ্বায়ন তাদের হাতে যে সব ভোগ্যপণ্য তুলে দিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ভিডিও গেম। এই গেম গুলোতে তারা নির্বিচারের হত্যা করে চলেছে নিজেদের প্রতিপক্ষকে।

কত নৃশংস ভাবে হত্যা করা যায় তার নানা কৌশল ও উপকরণ রয়েছে ভিডিও গেমগুলোতে। বর্তমান সময়ের যে কিশোররা একসঙ্গে ধরাশায়ী করছে কয়েকশো প্রতিপক্ষকে, রক্তের বীভৎস দৃশ্য তাদের কাছে আর নতুন কী? ভিডিও গেম প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো বেশীরভাগই বিদেশি সংস্থা। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিহিংসার আবহাওয়ায় শুধু মাত্র গেছো ভূত বা পরপোকারী ভূতের গল্প বর্তমান সময়কে তুলে ধরতে অপারগ। এখনকার শিশু কিশোররা চায় দ্রুতগতির জীবন। তাৎক্ষণিকতা যেখানে অন্যতম উপাদান। সমাজ বাস্তবতার এই ছবিগুলো গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর সেই গল্প জগতে ধরা পড়েছে একবিংশ শতকের শিশু কিশোরদের মানসিকতা।

চারপাশে এত হিংসা প্রতিশোধ একটা সময় মানসিক বৈকল্য তৈরি করে। সেকারণে মনোবিদদের কাছে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই সবচেয়ে বেশি দারস্থ হয়। মানসিক এই বৈকল্যের পেছনে রয়েছে একাকীত্ব, মনের গ্লানি। সারা দুনিয়াকে নিজের প্রতিপক্ষ ভাবতে ভাবতে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কখনো বা অপরাধের গ্লানি তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে।

দীপান্বিতা রায়ের গল্প ‘সেই লোকটা’ গল্পে অপরাধবোধ এবং সেই বোধ সঞ্জাত মানসিক গ্লানির ‘মোটিফ’ রয়েছে। তিনবন্ধু অফিস থেকে ছুটি নিয়ে গাড়োয়াল হিমালয় বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনে উঠে রওনা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। মাঝপথে কোনো এক অজানা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। ট্রেন থেকে নেমে শান্তনু ও মৈনাক প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক ভিখিরিকে দেখতে পায়। মৈনাক তাকে কিছু সাহায্য করতে চাইলেও হাত চেপে ধরে শান্তনু। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ভিখিরিপনা যে আসলে বিনাশ্রমে টাকা উপার্জনের ফিকির সে বিষয়ে তার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতে থাকে। হঠাৎ গাড়ির সিগন্যাল সবুজ হয়ে যাওয়ায় দুইজন ছুটে এসে গাড়ির কামরায় উঠতে যায় এবং শান্তনুর পায়ে ধাক্কা লেগে ভিখিরির সামনে পয়সার বাটিটা ছিটকে যায়। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন যাওয়ার সময় শান্তনু লক্ষ করে -

> ‘‘কামরার দরজাটা যখন ভিখারিটাকে পেরোচ্ছে, তখন লোকটা হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো শান্তনুর দিকে। তার দুচোখে অসম্ভব জ্বলজ্বলে হিংস্র দৃষ্টি। শান্তনুর বুকের ভেতরটা কীরকম যেন অজানা আতঙ্কে শিরশির করে উঠলো।’’[৩৮]

মনের এই আতঙ্ক এরপর শান্তনুকে পেয়ে বসল। সবসময় তার মনে হচ্ছে সে যেন ভিখিরিটাকে দেখছে এবং একই রকম জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে সে তাকিয়ে আছে। কৌশানীতে রাতের বেলা নিজের বিছানায় শুয়ে শান্তনুর মনে হল, গায়ে কম্বল দেওয়া সেই ভিখিরির ছায়াশরীর যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে।

> ‘‘পায়ের শব্দটা এগিয়ে আসছে, শান্তনুর খাটের পাশে এসে থামল। সেই দুটো ভয়ঙ্কর জ্বলজ্বলে চোখ। শান্তনু বিস্ফারিত চোখে দেখল। সাদা চাদরটা সরে গেছে। হাতের বাকি অংশটা নেই। ততক্ষণে অন্য হাতটাও তুলে ধরেছে ভিখিরিটা। সেটাও কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। বিকট একটা চিৎকার করে ছুটে খাট থেকে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছিল শান্তনু।’’[৩৯]

সকালে উঠে জানা যায় রাতে জানালার পাশে যাকে দাঁড়াতে দেখেছিল শান্তনু আসলে সে হোটেলের কেয়ারটেকার। মানুষের মনের জমাট বাধা অন্ধকারেই মানুষ প্রত্যক্ষ করে তারই অন্তঃকরণের ভূতকে। শান্তনুর অপরাধবোধ যে মানসিক গ্লানি তৈরি করেছিল তারই পরিণামে বারবার ভিখিরিকে চোখের সামনে দেখেছে সে।

আড়াল থেকে কেউ কাউকে লক্ষ করছে, অনুসরণ করছে ও এক ভৌতিক অস্তিত্বের বোধ। অথচ চেতনার সীমানায় আর সেই ভৌতিক আবহের শরীরী উপস্থিতি নেই। আবার সেই অশরীরীর উপস্থিতিকে অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। চেতনার সঙ্গে অবচেতনের এই দ্বন্দ্ব তৈরি করে আত্মিক সংকট, অস্বস্তি। বিশ্বায়নের কালপর্বে সেরা সম্পদ এই অস্বস্তি। ভয় থেকে অস্বস্তির দিকেই ক্রমাগত তার যাত্রা। ইহলোক, পরলোক, পাপ, পুণ্য এইসব ধারণার উর্দ্ধে আধুনিক মানুষের নিজেকে নিয়েই মূল সংকট। ব্যক্তিস্বার্থ, বিচ্ছিন্নতা নিয়ে বারবার সে প্রত্যক্ষ করেছে নিজের ভেতরে

অবদমিত অন্ধকারকে। বারবার ছায়াময় সেই অস্তিত্বের কাছে গিয়ে চমকে ফিরে আসে মানুষ। সে কারণে ভূতের গল্পে কেবল মাত্র ভয়ানক নয়, অদ্ভুত রসেরও আয়োজন রয়েছে।

প্রতিনিয়ত কেউ আমায় দেখছে, আমি কারোর নজরবন্দী। এই ধারণাকে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। বিশ্বায়ন আমাদের ভৌগোলিক সীমানা মুছে দিয়েছে এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেশ বিদেশের হালহকিকত সবই বর্তমান সময়ে মুঠোবন্দী। খেয়াল করলে দেখা যাবে এই কালপর্বে কিছুই আর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে নেই, রাষ্ট্র যেভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেইভাবেই চলতে বাধ্য সে। 'ফেসবুক', 'হোয়াটসঅ্যাপ' এই সবের মধ্যে যত জড়িয়ে পড়েছে মানুষ, ততই তার গতিবিধি সহজেই নজরবন্দী করেছে রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত যা অনুভূতি সেও বিশ্বায়নের কালে বিজ্ঞপ্তির মতো ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায়, নিজেকে জাহির করতে করতে মানুষ ভুলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত সে আসলে ধরা পড়ে যাচ্ছে বিশ্বায়নের তৈরি করে দেওয়া বাজার অর্থনীতির কাছে। একসময় আর নিজস্বতা বলে কিছুই থাকে না। রাষ্ট্র বা বাজার যে চাহিদা তৈরি করে দেয় কেবলমাত্র তারই অনুসরণ আধুনিক মানুষের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেকারণে আড়াল থেকে লক্ষ রাখছে পুঁজিবাদী সমাজ, বা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাদের চাহিদা অনুযায়ী চলতে না পারলে তৈরি হবে আত্মিক সংকট। সমাজ তাদের এতই বিচ্ছিন্ন করে রাখবে যে মানসিক অবসাদ ছাড়া আর কোনো ভবিতব্য থাকবে না।

সৌম্য নারায়ণ আচার্য-এর গল্প 'ভূতুড়ে হাত' -এ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানুষ যে আসলে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে তার ছবি স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের কথক ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে নিজের হাত খোয়ান। তারপর ডাক্তার মিত্রর পরামর্শে নতুন হাত জুড়ে দেওয়া হয় অপারেশন করে। ড. মিত্র এই অপারেশন করেছিলেন বিনি পয়সায়। কাউকে এই অপারেশনের কথা বলতে মানা করেছিলেন কথককে। অপারেশনের পর থেকেই বিপত্তি শুরু হল। কথক সাদামাটা জীবন যাপন করতেন তার সামর্থ অনুযায়ী, কিন্তু নতুন এই হাত ক্রমাগত তাকে প্রলুব্ধ করল

বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য। শেষে উপায়ন্তর না দেখে চুরি পর্যন্ত শুরু করলেন গল্প কথক। কিছুতেই আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তিনি। কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বলে বারবার প্রলুব্ধ হচ্ছেন। একের পর এক অসামাজিক কাজকর্ম করছেন। প্রতিটি ঘটনার পর মানসিক অবসাদে ভুগছেন। আত্মগ্লানি তাকে মর্মাহত করে তুলেছে।

> ''কয়েকদিন পরে জ্যাঠতুতো দিদি বাড়িতে এসে নিজের দামি নেকলেসটা খুলে ড্রয়ারে রেখে স্নান করতে গিয়েছে। অমনি আমার ডান হাত ড্রয়ারটা খুলে সেটা নিয়ে আমার বুক পকেটে রেখেছে। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, ডান হাতটা আমার শরীরের অঙ্গ হলেও ওটা আমার আয়ত্তে নেই।।''[৪০]

কিছুই 'আমার' নিয়ন্ত্রণে নেই, বরং আমি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি- এই বোধ নিরাপত্তাহীন এক আত্মিক সংকট তৈরি করে। শিশু কিশোর পাঠ্য গল্পগুলির মধ্যে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে অস্তিত্ব সংকটের এই বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বড়দের ভূত' এবং 'ছোটদের ভূত' আলোচনা করবার সময় যৌনতার প্রসঙ্গ এই দুটি বর্গের পার্থক্য নিরুপণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক ছিল। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী কালে শিশুকিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পে যৌনতার 'মোটিফ' লক্ষ করা যায়নি। ন'এর দশক থেকে গল্পগুলির মধ্যে যৌনতার ধারণা জায়গা করে নিল। আসলে শিশু কিশোরদের মননের যে আদর্শ ছবি উনিশ শতকে থেকেই সমাজ তৈরি করে এসেছিল, বিশ্বায়ন সেই আদর্শ কেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যে সমাজে নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণ করা হয় এবং তারপর মিডিয়া ও সোশাল নেটোয়ার্কিং-এ তা নিয়ে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, মতামত উঠে আসে, সেখানে যৌনতার ধারণাকে বাদ দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের মনস্তত্ত্বকে বোঝা সম্ভব নয়। যৌনতার ধারণা শিশু-কিশোর মনে এতদিন ছিল প্রচ্ছন্ন, কিছুটা পরিমাণে অবদমিত, সেকারণে গল্পগুলোতেও তার প্রতিফলন সেভাবে ঘটেনি। বিশ্বায়ন পরবর্তী সমাজ এই আড়াল উন্মুক্ত করে দিল। বিদ্যালয়গুলোতে যৌনতা

সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করবার জন্য শুরু হলো জীবন শৈলির ক্লাস। সেকারণে যৌনতা আর সামাজিক ট্যাবু হয়ে রইল না। গল্পেও এই ধারণার প্রতিফলন, বিশ্বায়নের সময়ে বেশ জোরালো হয়ে উঠল।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'এ কী?' তে যৌনতার ধারণা সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। গল্প কথকের দুই মামা এবং মাসি সকলে মিলে যাচ্ছে স্বপ্নে পাওয়া এক বাড়ির সন্ধানে। কথকের বড় মামার স্থির বিশ্বাস এই স্বপ্নের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষের কোনো যোগ রয়েছে। তাদের সঙ্গী হয়েছে উমা। কথকদেরই প্রতিবেশী সে। একবার উমার সামনে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় কথকের লজ্জার অবধি ছিল না।

''আমি উমার দিকে তাকাচ্ছি না। লজ্জা করছে। এই তিন চারদিন আগে ওদের বাড়ির সামনে পা পিছলে ধপাস। ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। দৌড়ে এসে হাত ধরে তুললো। ইটের টুকরোয় হাঁটুটা কেটে গিয়েছিল। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে ড্রেস করে ব্যান্ড লাগিয়ে ছিল। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, ''শুকনো ডাঙায় পড়লে কি করে?''

> ''মেয়েদের সামনে পড়ে যাওয়াটা ভীষণ লজ্জার। কিন্তু উমা কি ভালো মেয়ে! হাসে নি। মুখটিপে ও না। বরং বলেছিল। চটিটা পাল্টাও। তলাটা ক্ষয়ে গেছে।''[৪১]

বয়ঃসন্ধির কালে মানসিক যে বিবর্তন তার আভাস রয়েছে গল্পে। উমার প্রতি কথকের যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, গল্পে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বিশ্বায়নের কালে স্বাভাবিক এই আকর্ষণ বা ক্ষেত্র বিশেষে কৌতূহলকে আদর্শ কৈশোর ভাবনার তত্ত্বে আড়াল করা হয়নি। সময়ের দাবী মেনেই গল্পে যৌনতার ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুধীন্দ্র সরকারের গল্প 'আজব বিনুনি' তেও যৌনতার ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পের শুরুতেই এর আভাস দিয়েছেন লেখক।

''অ্যাই শোনো! মেয়েটা বললে, হ্যাঁ তোমাকেই বলছি'', বলতে বলতে কাস্তের মতো বাকা সুরু চুলের বিনুনিটা দুলিয়ে কথকের সামনে এসে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়াল।

> ''মেয়েটার সাহস তো কম নয়! সাত আট বছর বয়স হবে। অচেনা ছেলেকে এভাবে ডাকে কেউ? তাও আবার ধমকের সুরে? ওর কাণ্ড দেখে আমি হেসে ফেললাম। বিশেষ করে ওর চুলের বিনুনি দেখে, হাওয়ায় দুলছিল ওর বিনুনি। বিনুনি পিঠের পরে লতিয়ে থাকে। কিন্তু ওর বিনুনিটা একেবারে অন্যরকম। মজাদার। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার নাম কী?' 'দুলালী' বলেই বিনুনি দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি ওর বিনুনিতে হাত দিতে গেলুম।''[৪২]

যৌনতার ধারনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কৌতূহল। সেই কৌতূহল বশেই কথক বিনুনিটা ধরে দেখার জন্য উদগ্রীব হল। ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুযায়ী চুলের সঙ্গে যৌনতার যে নিবিড় সম্পর্ক গল্পে তার ইঙ্গিত রয়েছে। বিনুনির যে বর্ণনা কথক দিচ্ছেন তা তো আসলে বয়ঃসন্ধির দেখা। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এই আকর্ষণ বয়ঃসন্ধিরই ধর্ম। সামাজিক ট্যাবু ভেঙে বিশ্বায়ন কিশোরদের মনের সুকোমল নীতিবাগীশ অনুভূতির পাশাপাশি অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূলকেও গল্পজগতে টেনে আনল।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী 'অনিলিখা ও ভূত'-গল্পে প্রেম ও প্রতিশোধের নির্মম ছবি তুলে ধরেছেন। সেই অনুসঙ্গেই এসেছে যৌনতার ধারণা। গল্পের কথক অনিলিখা ভূতের সঙ্গে কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা বলেছে গল্পে। রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের সামনে থেকে একটি মেয়ে অনিলিখার গাড়িতে এসে উঠে বসল। অনুরোধ করলো মেয়েটির গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। অনিলিখা মেয়েটির সঙ্গে কথোপকথনে জানতে পারে ক্লদিয়া চরিত্রে মেয়েটি আজ অভিনয় করেছে থিয়েটারে।

> ''শোনা যায় ক্লদিয়া নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রোমান মেয়েকে ওর বন্ধু এখানে একটা গ্ল্যাডিয়েটর শো দেখাতে নিয়ে এসে হত্যা করে। জলের মধ্যে বিষ খাইয়ে। তারই চরিত্রে অভিনয় করছিলাম।।''[৪৩]

কবরখানার কাছাকাছি এসে গাড়িটা থামাতে বলে মেয়েটি। ঠান্ডা হাতে অনিলিখাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেয় সে। পরে 'ডেলিমিরর' সংবাদপত্রে মেয়েটির মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারে অনিলিখা। ক্লদিয়ার চরিত্রে অভিনয় করবার সময় মেয়েটির বন্ধু সেই জলে বিষ মিশিয়েই তাকে হত্যা করে। গাড়িতে বসে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেয়েটি অনিলিখাকে বলেছিল তার মৃত্যু ভয়ের কথা।

> ''ও বলেছিল, ওর সঙ্গে বন্ধুর ভূমিকায় নাটকে যে ছিল সে তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তার হাতে নাটকে জল খাবার সময় ওর যেন হঠাৎ মনে হয়েছিল এ অন্য কেউ। তার সঙ্গে আগে কোনো দিন অভিনয় করেনি। আর জল দিয়ে আস্তে আস্তে লোকটা ওকে ল্যাটিনে কিছু কথা বলেছিল।
>
> সেদিন এই প্রশ্নের কোনো উত্তর মেয়েটি দেয়নি। শুধু হেসেছিল রহস্যজনকভাবে।''[৪৪]

প্রতিহিংসা এবং যৌনতার এই 'মোটিফ' বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে পাওয়া যায় নি। গল্পগুলির সামগ্রিক আলোচনায় শিশু কিশোরদের যে মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট হয়েছে, তার বিচারে শিশু এবং কিশোর এই দুটি বয়সের ধারণাকে কি আর এক শিরোনামে রাখা সম্ভব? শিশুর কোনো লিঙ্গান্তর হয় না, কিন্তু কিশোর ও কিশোরী দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নসত্তা।

এতদিন যৌনতার ধারণাকে প্রচ্ছন্ন রেখে কেবলমাত্র কিশোর নাম দিয়ে সামগ্রিক কৈশোরের আদর্শ ভাবমূর্তি তৈরি করা হত। এও আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বের সংকটও বেড়েছে। সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে তাদের বেড়ে ওঠা। ভালো মন্দের মাঝে আরও সূক্ষ্ম 'থাকা', 'না-থাকা' ভাবিয়ে তুলেছে তাদের। সে কারণে 'শিশু-কিশোর' এই এক শিরোনামে বর্তমান প্রজন্মের মনস্তত্ত্বকে বোঝা সম্ভব নয় আর। বিবর্তিত সমাজ ও মনের সঙ্গে পুরাতন শিরোনাম নতুন বিকল্পের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

১। সৈয়দ, মুস্তাফা সিরাজ, 'আম কুড়োতে সাবধান', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২, পৃষ্ঠা ১৫

২। দাশগুপ্ত, মহুয়া, 'এক ভূত-মানুষের গল্প', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৬৫

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬

৬। সৈয়দ, মুস্তাফা সিরাজ, 'তিন আঙুলে দাদা', আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ১১৮

৭। মুখোপাধ্যায়, মণিলাল, 'দুঃখীরাম শান্তিরাম', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২৭৫

৮। ঘোষ, শুভমানস, 'জেনুইন বন্ধু', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২১, পৃষ্ঠা ১১০

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন, 'জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা', শুকতারা, কলকাতা, দেবসাহিত্য কুটির, কার্তিক ১৪১৭ পৃষ্ঠা ১১৮

১০। চট্টরাজ, রূপক, 'চন্দনপুরের এক রাত', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা আশ্বিন ১৪২০, পৃষ্ঠা ২৮২

১১। তদেব, পৃষ্ঠা ২৮৪

১২। মুখোপাধ্যায়, মণিলাল, 'দুঃখীরাম শান্তিরাম', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২৭৭

১৩। সরকার, কঙ্কন, 'ভূতের সঙ্গে দেখা', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২৭৯

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩

১৫। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'সানরাইজ লজ', শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২০, পৃষ্ঠা ৩০

১৬। তদেব,

১৭। চক্রবর্তী, জয়দীপ, ‘স্কুলের টানে’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৪৪৩

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৪৪

১৯। চক্রবর্তী, দীপ, ‘ভূতেদের বিপ্লব’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২২, পৃষ্ঠা ২৫৫

২০। তদেব

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ২৫৬

২২। সরকার, শংকরলাল, ‘রহস্যময় হাড়’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, চৈত্র ১৪১৮, পৃষ্ঠা ১১

২৩। তদেব

২৪। সিরাজ, সৈয়দ, মুস্তাফা ‘কালো ছড়ি’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, চৈত্র ১৪০৩, পৃষ্ঠা ৮

২৫। তদেব

২৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘অদৃশ্যের মন্ত্রণা’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১৫ পৃষ্ঠা ২৬

২৭। তদেব

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০

৩১। গুপ্ত, প্রচেত, ‘দিনের বেলাতেও ভূত দেখা যায়’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা ৫৯

৩২। দাস, নীলনাথ, ‘সেই সন্ধ্যায়’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪২২, পৃষ্ঠা ১২

৩৩। দেব, অনীশ, (সম্পা.) *সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক*, পত্রভারতী, কলকাতা, জুলাই ২০১৮

৩৪। মজুমদার, বিপুল, ‘মুক্তিদাতা’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, মাঘ ১৪২১, পৃষ্ঠা ১৬

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৮

৩৬। তদেব

৩৭। দাশগুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর, ‘রক্তচোষা’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২২, পৃষ্ঠা ১৪

৩৮। রায়, দীপান্বিতা, ‘সেই লোকটা’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৩, পৃষ্ঠা ১১

৩৯। তদেব পৃষ্ঠা ১৩

৪০। আচার্য, সৌম্যনারায়ণ, ‘ভূতুড়ে হাত’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৪

৪১। চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ‘এ কী’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২১, পৃষ্ঠা ৫৭

৪২। সরকার, সুধীন্দ্র, ‘আজব বিনুনি’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২২, পৃষ্ঠা ৫৪

৪৩। রায় চৌধুরী, অভিজ্ঞান, ‘অনিলিখা ও ভূত’, শুকতারা, কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, আশ্বিন ১৪২২, পৃষ্ঠা ১৮০

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

পত্রিকায় ভূতের গল্পের আখ্যান ও ভাষা : পরিবর্তনের চিহ্ন

এই অধ্যায়ে বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্পের আখ্যান কীভাবে পরিবর্তিত হলো এবং ভাষা ব্যবহারে কী বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হল সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনার পরিধিকে তিনটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি উপবিভাগে আলোচনা প্রসঙ্গে বদলের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে। উপবিভাগগুলি যথাক্রমে -

(ক) কথনরীতি / কথক
(খ) ভাষা ব্যবহার
(গ) চিত্রকল্প

(ক) কথনরীতি / কথক :

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' (Poetics) গ্রন্থে ঘটনা (action) এবং চরিত্রকে (Character) কোনো কাহিনির আবশ্যিক দুটি উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অ্যারিস্টলের মতে ঘটনা এবং চরিত্রের কার্যকারিতা আসলে পরিপূরক। মূল কাহিনি বিভিন্ন ঘটনার যে পারম্পর্যে বিন্যস্ত হয়, সে বিন্যাসই কাহিনিকে সাংগঠনিক শক্তি প্রদান করে। এই বিন্যাসই আসলে ঘটনা নিরূপিত প্লট।

ভূতের গল্পের ক্ষেত্রে ঘটনা এবং চরিত্রের কার্যকারিতা দুই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি কথকের গুরুত্ব ভূতের গল্পের আখ্যানে অনস্বীকার্য। কথকই আসলে ভূতেদের গল্পজগতকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। পাশাপাশি থাকে অতীতের প্রসঙ্গ। কাহিনির বর্ণনাকাল থেকে কাহিনির সংগঠনকালের মধ্যে সময়ের বিস্তর ব্যবধান বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী আখ্যানের বৈশিষ্ট্য। কথক বেশির ভাগ গল্পই বলতেন প্রথম পুরুষ বচনে। অন্য

কারোর থেকে গল্প শুনে তারপর কথক সেই গল্প বলেছেন এমন উদাহরণও বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী সময়ে দুর্লভ নয়। মোটকথা বিশ্বাস অবিশ্বাসের দায় এড়াবার জন্য ভূতের গল্পগুলোতে সময়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হত। 'গল্প' হিসাবে সার্থক হয়ে ওঠার যে দায় তার অন্যতম মানদণ্ড ছিল পাঠক বা শ্রোতার বিশ্বাস। সেকারণে আখ্যানের সংলাপে বারবার ফিরে আসত কথকের বিশ্বাস প্রতিপন্নের দায়। গল্প বললেও এ যে আসলে সত্য ঘটনা অবলম্বনে বলা অভিজ্ঞতা, এমন সংলাপের উপস্থিতি বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পে অজস্র। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনের সরলরৈখিক জীবনধারার ছাপ পড়ত সেই সময়ের গল্পের আখ্যানে। প্লট থাকত নির্দিষ্ট এবং গল্পের পরিণতিও বহুক্ষেত্রেই একমুখী। একবিংশ শতকের সমাজ বাস্তবতার ছাপ শিশু-কিশোরদের মনকে আচ্ছন্ন করার আগে পর্যন্ত উনিশ শতকের শিশু-কিশোর নির্মাণের যে সামাজিক আদর্শ তাই কম বেশি গল্পের আখ্যানে লক্ষ করা যেত। বিশ্বায়ন এসে সামন্ততান্ত্রিক নিরাপত্তার যে ধারণা তাকে বিপন্ন করে তুলল। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'হাইটেক সিটির' দ্রুতগামী জীবনধারা প্রভাবিত করল শিশু-কিশোরদের জীবনকে। সে কারণে এই সময়ের গল্পের অখ্যানে ক্ষিপ্রতা পরিলক্ষিত হল। ভৌতিক ঘটনা বুঝে ওঠার আগেই চমক তৈরি করে অস্বস্তি তৈরি করাই বিশ্বায়নের কালপর্বে ভূতের গল্পগুলির আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রতিস্থাপন করার দায় আর এই সময় পর্বের আখ্যানে লক্ষ করা গেল না বরং অস্বস্তিটুকু জিইয়ে রাখাই আখ্যানের নতুন তারিকা - যা আসলে ক্রমবির্তমান সময়েরই চিহ্ন বহন করে।

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পের আখ্যানে ভূতেদের শরীরী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আখ্যানগুলির মধ্যে একধরণের শ্লথতা রয়েছে। জীবনময় গুহর গল্প 'বেক্ষদৈত্য'তে সরাসরি নিজের আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে ভূতেরা উপস্থিত।

> ''সেদিনও দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর টুটুলকে কোলের কাছে শুইয়ে ঠাকুমা গল্প বলছিলেন। মনোযোগ দিয়ে সেই গল্প শুনছিল টুটুল। টুটুলের নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গল্প আর ফুরোয় না। এক সময় ঠাকুমা বলেন ''ঐ

দ্যাখ তাল গাছ, ঐ লম্বা তালগাছের মাথায় কী আছে জানিস? বিছানার পাশের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল গাছ পালা, মাঠ, ক্ষেত, পুকুর, সুপরী বাগান, একটু দূরে আনারস বাগানের কাছে লম্বা একটা তালগাছ। সেই তালগাছের দিকে তাকিয়ে টুটুল প্রশ্ন করে -

'ওখানে কে থাকে ঠাম্মা?

বেহ্মদৈত্যি।

সেটা আবার কি?

বিরাট এক দৈত্য

দেখতে কেমন?

ভয়ঙ্কর। মাথায় দুটো শিং, দাঁতগুলো মূলোর মত। লম্বা হাত, খাটো পা, বড় বড় নখ। আর চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো।''[১]

অলস দুপুরে নিরাপদে ভূতের গল্প শোনার রেওয়াজ বিশ্বায়নের সময়ে একেবারে উঠে গেল। এই সময় পর্বের চরিত্ররা নিজেই গল্পের কথক হয়ে উঠলেন। গল্পের কাহিনি কাল এবং সংঘটনকালের মধ্যে ব্যবধানও গেল ঘুচে। উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশে কাহিনির যে সরল একমুখী চলন, বিশ্বায়নের কালপর্বে তা বিবর্তিত হয়ে আখ্যানে এক মিশ্র বাচনভঙ্গি তৈরি করেছে। গল্পের কথক এবং শ্রোতার অবস্থান ও এই সময়পর্বে আর নির্দিষ্ট থাকল না। শাশ্বতী চন্দের গল্প 'দৈত্যের বাগানে কিছুক্ষণ' গল্পে কথক এসেছেন নতুন একটা বাগান কিনতে। বাগানের বর্ণনা কথকের সংলাপে উঠে আসে। তবে এই সংলাপ আত্মকথন।

''বাগানের পশ্চিম দেওয়ালে ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। বর্ষার তেজি রোদ, তবে এদিকটায় স্নিগ্ধ হয়ে আছে। ঝিরঝির মিষ্টি বাতাস বইছে। টানা ছয় ঘন্টা উজিয়ে এসেছে। সঙ্গে অমূল্য ছিল। আমার ড্রাইভার।তবু নিজেও বসেছি কখনো ড্রাইভিং সিটে। এখন বাধানো বেদীতে বকুল গাছের তলায় বসে পাখিদের নানা সুরে ডাকাডাকি শুনতে শুনতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে।''[২]

গল্পের মুখ্য চরিত্র গল্পের কথক। গল্পের মধ্যে কোনো শ্রোতা নেই। পাঠকই গল্পের শ্রোতা। কথকের বাচনভঙ্গিতে আত্মকথনের ভঙ্গি লক্ষ করার মতো। ভূতের প্রেক্ষাপট তৈরির আগে, কথকের বাচনে উঠে এসেছে নাগরিক ক্লান্তির ছাপ। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পগুলোতে 'অলস' দুপুরে বা 'নিস্তব্ধ' রাতের অন্ধকার আখ্যানের মধ্যে ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করত। বর্তমান সময়ে নাগরিক মনের প্রতিযোগিতার বাজারে অলস হবার কোনো উপায় নেই। আর রাত্রির নৈঃশব্দ মিলিয়ে গেছে শহুরে আধুনিকতায়।

যে বাগানটি কথক কিনতে এসেছেন, সেটি তার মামাবাড়িতে কাটানো শৈশবের বাগান, বাঁধানো বেদীতে বসে থাকার সময় কথকের সামনে আসে তার শৈশবে দেখা এই বাগানের মালি জগবন্ধু। মালিকে দেখে তার মনে হয় সে বিন্দুমাত্র বদলায় নি। এতদিন পরে পুরোনো মানুষটিকে দেখে কথক চলে যান শৈশবের স্মৃতিপথে।

> ''জগবন্ধুকে প্রথম দেখার দিনটি মনে পড়ে গেল। স্কুল থেকে ফিরছিলাম। আশেপাশে একরাশ ছেলে। বন্ধু? না। তেমন করে বন্ধু হয়ে ওঠেনি কেউ। শুধুই মুখচেনা।''[৩]

'অতীত' ভূতের গল্পের আখ্যান সবসময় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে থেকেছে। অতীতের সূত্র ধরেই ভূতেরা বারে বারে এসেছে বর্তমানে। এই গল্পে লক্ষ করবার বিষয় অতীত কেবল ধারণামাত্র হয়ে গল্পে আসেনি। অতীতের সঙ্গে রীতিমতো সংলাপ বা ডিসকোর্স চলছে। কথকের আশেপাশে একরাশ ছেলে যে আসলে বন্ধু নয় সহপাঠী, এই ধারণা তো আসলে বর্তমানের অতীতকে পুনর্বিচার বিচার। নাহলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে সংশয়ের অবকাশটুকু রাখতেন না কথক। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পেও অতীতের প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু সে কেবল সময়ের ধারণার দ্যোতক। কাহিনিকালের সঙ্গে সংঘটনকালের দূরত্ব জ্ঞাপন করেই সে তার দায়িত্ব শেষ করেছে। আধুনিক কালে, মানুষের মনের যে সংশয় সেই সংশয়ের মধ্যেই অতীত বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। প্রশ্ন করেছে 'বর্তমান'কে।

গল্পের একেবারে শেষে এসে জানা যায় গল্পকথক এই বাগানে প্রবেশ করবার আগেই গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। বাগানের বাইরে এখনো পড়ে আছে তার রক্তাক্ত দেহ।

> ''.....আমি তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি, এই বাগানে, চিরদিনের মতো। এই বাগান আমি কিনে নিয়েছি। আর কেউ এখান থেকে আমাদের উৎখাত করতে পারবে না। বলতে বলতে চোখ ফেরালাম পশ্চিমের দেওয়ালের দিকে। একটু আগের ঝকঝকে রোদ এখন ম্লান। ওপাশে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। যাবেই তো। লোক জুটেছে। পুলিশও এসে গিয়েছে নিশ্চয়। ওখানে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে আমার লাল শেভ্রলেটা। একটা দরজা খুলে গিয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্টিয়ারিংয়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে আমার পার্থিব শরীর। নিথর, কপাল বেয়ে নামছে রক্ত। চোখ বন্ধ।''[৪]

স্থান এবং সময়ের ধারণার সরল রৈখিক অবস্থান এই গল্পের আখ্যানে নেই। নির্বিকল্প 'অতীত' এবং বর্তমানের ধারণাও ভেঙে গেছে এই আখ্যানে। গল্পের শুরুতে, যে কথক 'বর্তমান' ছিলেন বলে আমাদের মনে হয়, তিনি আসলে অতীত। সেক্ষেত্রে গল্পের মধ্যেও শৈশবের স্মৃতিচারণা, আসলে অতীত হয়ে বর্তমানকে অতিক্রম করে পুনরায় অতীতকে দেখা। উত্তম পুরুষ বাচনে এই কথনভঙ্গিতে কথক কি একবারও নিজেকে অতীত বলে ভাবছেন? না ভাবছেন না। বরং মৃত্যুর পর তার অবস্থাই তার কাছে প্রত্যক্ষ বর্তমান। আর যে জীবন তিনি বাগানের বাইরের রাস্তায় ছেড়ে এসেছেন সেটিই এখন অতীত। নিজেই নিজের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করার ঘটনা বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পের আখ্যানে নেই। এটি একান্তই একবিংশ শতকের 'মোটিফ'। নিজের মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখা বা মৃতদেহকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা এই দৃশ্যগুলো আমাদের পার্থিব জীবন সম্পর্কে একধরণের সংশয় তৈরি করে। আমার 'থাকা'-র যে বোধ তাকে নেতির দিকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। আমাদের ইন্দ্রিয় নির্ভর অস্তিত্বের যে বোধ তাকে বিপন্ন করে তোলে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সমাজ জীবনের

যে নিরাপত্তাহীনতা তা এই বিপন্নতার জন্ম দেয়। পরবর্তিত সময়ে সঙ্গে সঙ্গে এই সংশয় ও সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিশু-কিশোরদের গল্পজগতের আখ্যানে।

ভূতের গল্পের আখ্যানে চরিত্রের বিবর্তনের দিকটিও বিশ্বায়ন পরবর্তী গল্পে স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পে ছোটদের উপস্থিতির হার অনেক বেশী। কখনো শ্রোতা হিসাবে তারা গল্পে উপস্থিত থেকেছে, কখনোও বা তাদের সঙ্গেই ঘটেছে ভৌতিক কাণ্ড। শিশু কিশোরদের পত্রিকা হলেও বিশ্বায়নের পরের থেকে তাদের চরিত্র হিসাবে গল্পে উপস্থিতির হার গেল কমে। এমন কী শ্রোতা হিসাবেও তাদেরকে আর গল্পে পাওয়া গেল না।

তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, বৈঠকী চালের গল্পগুলো বিশ্বায়নের পরে তেমনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। কর্মব্যস্ত জীবনে গল্প বলার অবসর নেই মানুষের। গল্পের কথক যদি না থাকে তাহলে শ্রোতা তৈরি হবে কীভাবে? বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্পের চরিত্র হিসাবে যারা উঠে এসেছে তারা কেউই কিশোরদের সমবয়সী নয়। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা, সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত এমনকি পেশাগত সমস্যা নিয়ে শিশু-কিশোর গল্পের জগতে তাদের অবতরণ।

শোভন পাঠকের ‘‘নো নম্বর ডাকছে’’ গল্পে সাংবাদিকের পেশাগত ঝামেলা এবং সেই প্রসঙ্গে সমসাময়িক রাজনীতির কথা উঠে এসেছে। বিশ্বায়নের কালে তথ্য যে পণ্যে পরিণত হয়েছে এই গল্পে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

> ‘‘এখন ফোনটা রিসিভ করলেই শুনতে পাব মার্জিত একটা স্বর আমাকে আহ্বান জানাচ্ছেন- ‘চলে আসুন একদিন আমার বাড়ি’।
> কিন্তু কেন?
> আপনি তো অন্যধরণের খবর পছন্দ করেন।
> ‘অন্য ধরণের খবর’ কথাটাই গত একমাস ধরে ভাবাচ্ছে।

আমার সাংবাদিক জীবনের উন্নতির পেছনে অন্য ধরণের খবরের একটা ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সেটা তো এর জানবার কথা নয়। খবর তৈরিতে যাদের কাজে লাগিয়েছি তাদের কেউ? যাদের হারিয়ে আমি উন্নতি করেছি তাদের কেউ?''[৫]

গল্পের আখ্যানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রসঙ্গে পাশাপাশি লক্ষ্মণীয় আখ্যানের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা গ্লানি এবং সেই গ্লানি সঞ্জাত অস্তিত্বের সংকট। গোটা গল্পে কোনো কিশোর চরিত্র নেই। একেবারেই রাজনৈতিক একটি গল্প। আসলে দ্বিধা, গ্লানি, অস্তিত্বের সংকট মানুষকে বিপন্ন করেছে। অপরাধবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে এই সময়ের গল্পগুলোতে। মনের জমাট বেঁধে ওঠা এই অন্ধকারকে আশ্রয় করে বিশ্বায়নের ভূতেদের আনাগোনা বেড়েছে। মানুষের সামনে বারবার অশরীরীরা তুলে ধরেছে সমালোচনার আয়না। সেই প্রতিবিম্বে বিশ্বায়িত মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে নিজের ভেতরের জমাট বাঁধা অন্ধকারকে, নিজের ভেতরেই লুকিয়ে থাকা ভূতকে।

একবিংশ শতাব্দীর ভূতের গল্পে ভূতেদের চরিত্রের বিবর্তনও লক্ষ করবার মতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিজেদের বিবর্তিত করেছে। গল্পের আখ্যানে যে 'সময়' ধরা পড়েছে তা কখনো মানুষের চরিত্রে সমসাময়িক বাস্তবকে তুলে ধরেছে, কখনো বা ভূতেদের মধ্যমে, মানুষ এবং ভূতেদের নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা এই পর্বের গল্পের আখ্যানে রইল না। ভূতেরা হয়ে উঠলো ছায়াময়। প্রলম্বিত সেই ছায়াই গল্পে রেখাপাত করল চরিত্র হিসাবে।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'লেখক ভূত' গল্পে সম্পাদকের চাপে পড়ে পত্রিকার নতুন সংখ্যার জন্য গল্প লিখতে কলকাতা থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে মফঃস্বল শহরে এসেছেন কথক। হোটেলের ২১৩ নম্বর ঘরে নিভৃতে লেখার সময় মূর্ত হয়ে ওঠে ছায়াশরীর। জীবদ্দশায় সেও লেখক ছিল। নাম ছিল অংশুমান। পান্ডুলিপি নিয়ে সম্পাদকদের বাড়ি ঘুরেও একটি লেখা প্রকাশ পায়নি তার। হতাশায় দুঃখে আত্মহত্যা করে অংশুমান। এই গল্পে মানুষ এবং অশরীরী পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিক কথা বলে।

ভয়ের লেশমাত্র সেখানে নেই বরং দুজনের কথোপথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামাজিক সংকট। অংশুমানের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত আসলে প্রত্যশা ও প্রাপ্তির মাঝের ব্যবধানকেই স্পষ্ট করে তোলে। কথক অবশ্য কথা রেখেছেন। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় অংশুমানের বই।

> ''অংশুমানের ভূতকে যা কথা দিয়েছিলাম রেখেছি। ভালো প্রকাশনা থেকে গত বইমেলায় বেরিয়েছে - 'অংশুমানের গল্পের বই।''[৬]

ভূতেদের ছায়াময় উপস্থিতি এই সময়পর্বে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মাঝে ভূতদের অবস্থানই বিশ্বায়িত ভূতেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বাইরের পৃথিবীর আলো এত বেড়ে গেছে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির হাওয়ায় ভূতের গল্পকে বারে বারে অস্তিত্ব সংকটে পড়তে হয়েছে। সেকারণে রোমাঞ্চ এবং ভয় বজায় রাখবার জন্য ভূতের গল্পে এসে কখনো মিশেছে কল্পবিজ্ঞানের উপাদান, আবার কখনো এসেছে গোয়েন্দা বা রোমাঞ্চ কাহিনির উপকরণ।

অনুপম রায়ের ''অশরীরীদের আস্তানায়'' গল্পে গোয়েন্দা গল্পের মোটিফ লক্ষ করা যায়। 'Indian Ghost Club' থেকে প্রতিবছর যে অধিবেশন আয়োজন করা হয় সেখানেই আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন কথক। পাশাপাশি চলবে প্রেত অভিযান। 'ডি সুজা চওল' বাড়িটাকে ঘিরে ভূতুড়ে বদনাম প্রায়ই শোনা যায়। যে দক্ষতায় সেই বাড়ির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন তা প্রায় গোয়েন্দা গল্পের মতনই। নির্বিচারে মেয়েদের এনে সেই বাড়িতে মেরে ফেলা হত। রাতে নিশুতি অভিযান করে কথক এই তথ্যটি জেনেছেন।

> ''রাত বারোটার আগেই ডি'সুজা চাওলের বাড়ি থেকে
> বেশ খানিকটা দূরে যে যার মতো পজিশন নিয়ে বসে পড়েছি। হঠাৎ কুয়োর ডানদিক থেকে ছুম.... ছুম..... শব্দ পেয়ে সবাই সজাগ হয়ে গেছি।

একটু পরে নূপুরের শব্দ মিলিয়ে গিয়ে একটা ক্ষীণ আর্ত চিৎকার শোনা গেল - ওয়াচ, ওয়াচ, ওয়া.....চ! মারাঠি ভাষায় এর অর্থ বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও!''[৭]

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'সহযাত্রী'তে বিশ্বায়নের কালে মানুষের অস্তিত্বের সংকট কতটা প্রবল হয়েছে তার নিদর্শন রয়েছে। সঙ্গে রয়েচে রোমাঞ্চের শিহরণ।

গল্পের কথক গ্রামে গ্রামে ঘুরে হাতুড়ে ডাক্তারি করেন। তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েন এক গন্ডগ্রামে। অথচ কলকাতায় তাকে ফিরতেই হবে। দোকানের অর্ডারি মাল আনতে হবে সেখান থেকে। দূরে ফেরিঘাটের দিকে যাত্রা করে অনেক কষ্টে মাঝির দেখা পান। মাঝনদী থেকে নৌকো ফিরিয়ে তাকে নৌকোয় তোলে মাঝি। সে সময় একজন আগন্তুক এসে কথকের সঙ্গী হন। দুজনের মধ্যে কথোপকথনে কথক জানতে পারেন আগন্তুকের আসলে কঙ্কালের ব্যবসাা। রহস্যের 'মোটিফ' স্পষ্ট হয়ে ওঠে এরপর থেকেই।

''হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছি লোকটার দিকে, লোকটা বললো, 'কপালের দয়ায় আমাদের সোনার বাংলায় বেওয়ারিশ লাশের অভাব হয় না। আর একান্তই যদি না পাওয়া যায় তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। গাঁয়ে গঞ্জে, টাউনে লোকজনের তো অভাব নেই। মরা বা জ্যান্ত তুলে এনে আমাদের চৌবাচ্চায় ফেলতে পারলেই হল। গলা শুকিয়ে আসে আমার। ঢোক গিলে তাকাই চোখ পিটপিটিয়ে। লোকটা মাথা বাড়িয়ে দেয় সামনে, ফিসফিস করে ওঠে, 'আর তাও যদি না পাই আপনার মতো একা অসহায় মানুষ পেলেও চলবে। কঙ্কালের গায়ে তো আর লোকের ঠিকানা লেখা থাকে না!

মানে! কী বলতে চাইছেন? নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে পড়ি আমি।

শুনে খিকখিক করে হেসে উঠল আমার পিছনের গলুইয়ে বসে থাকা মাঝিটা। হৃদপিন্ডটা ধড়াস করে উঠল আমার। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তারমানে আপনারা একে অপরকে চেনেন? আর মানে আপনারা সাঁট করে আমাকে নৌকায় তুললেন?''[৮]

বিশ্বায়নের কালে মানুষের নিরাপত্তাহীনতার ছবি এই গল্পের আখ্যানে স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি এসেছে কঙ্কাল ব্যবসার মতো প্রসঙ্গ। নৌকার আগুন্তুক এবং মাঝি দুজনেই অশরীরী। অথচ গল্পের আখ্যানে সরাসরি এই প্রসঙ্গ না এনে রহস্যের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তীকালে সময়ের ব্যবধান আখ্যানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গল্পের ক্ষেত্রে গোটা ঘটনাটি ঘটেছে একটি মাত্র স্থান এবং কালের মাত্রায়। ভূতেদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আর 'অতীত' সময়সূচক ধারণার প্রয়োজন হল না। একুশ শতকে গল্পের ভূতেরা হানা দিয়েছে মানুষের চির অভ্যস্ত পরিবেশে। বিপন্ন করে তুলেছে তাদের 'বর্তমান'কে।

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্কীয়গ্রন্থ' গল্পে ভূতেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আশ্রয় করেছে। ফেসবুকে ভৈরব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হবার পর তার সঙ্গে একটি পুথির প্রয়োজনে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নেন কথক। পশ্চিম সিকিম ভ্রমণ করতে গিয়ে 'অঙ্কীয় গ্রন্থ' নামের একটি পুথি খুঁজে পান ভৈরব ভট্টাচার্য। পুথিটি অধ্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন এটি আসলে কম্পিউটারের ভাষার বই। পুথিটির ভাষা উদ্ধারের জন্য তিনি ফেসবুকে পোস্ট দেন।

> ''ফেসবুকে আমি মনের কথা লিখতে পারলেও কম্পিউটারের কোনো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। আমার বন্ধুবৃত্তে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে আধুনিক কম্পিউটারের ভাষায় পারদর্শিতা আছে এমন কেউ থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ ইনবক্সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি বইটি তাকে দেখিয়ে বইয়ের ভাষার মর্মাথ অনুধাবন ও আলোচনা করতে পারি।।''[৯]

যে স্থানে ভৈরব ভট্টাচার্যের বাড়ি, সে স্থান সম্পর্কে গল্পে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। ব্যাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে ভৈরব ভট্টাচার্যের কথা এক দোকানিকে জিজ্ঞেস করলে সে

অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে। এমন পাণ্ডব বর্জিত এলাকা অথচ মোবাইল ফোনে তিনি ভৈরব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছেন। নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা সেখানে নেই। অবশেষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে পুথিটি হাতে নিয়ে চমকে ওঠেন কথক। পুথিটাতে প্রচুর প্রোগ্রাম লেখা আছে, যার স্ট্রাকচার অত্যন্ত জটিল। 'ইফ-এন্ড-ইফ', 'ডু হোয়াইল লুপ এর মতো কিছু জিনিস কথক বুঝতে পারছিলেন। তবে না বোঝার ভাগটাই বেশি। ভৈরব গাঙ্গুলী জানান 'অঙ্কীয় গ্রন্থে' হিউম্যান ব্রেনের প্রোগ্রাম লেখা রয়েছে। বইয়ের বেশ খানিকটা পাতা কথককে পড়তে বললেন ভৈরব ভট্টাচার্য।

> ''এবার এই পাতাগুলো জোরে জোরে পড়ো। পড়তে আরম্ভ করলাম। অনেকগুলো যুক্তাক্ষর দেওয়া লম্বা লম্বা শব্দ। পড়া শেষ করে ভৈরব ভট্টাচার্যের দিকে তাকালাম। গম্ভীর মুখে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ''এবার আরেকবার মন দিয়ে শোনো। কী শুনতে পাচ্ছ।'' চোখ বন্ধ করলাম। বাইরে মেঘ ডেকে উঠলো। কড়াৎ করে বাজ পড়ার একটা আওয়াজ হল। তারপরে বৃষ্টির তোড়টা বেড়ে গেল। তারমধ্যে মনে হল জানালার বাইরে ক্ষীণ গলায় কে যেন বলে উঠল ''আমাকে ডাকলে কেন?''
>
> ক্রমশ আমার মনে হতে লাগল আমাকে ঘিরে ধরে অসংখ্য ছেলে মেয়ে বুড়ো চিৎকার করছে, ''আমাকে ডাকলে কেন?''
>
> আমার মনে হল আমি পাগল হয়ে যাব। দুহাতে কান চাপা দিয়ে উঠে চোখ কুচকে বন্ধ করলাম।''[১০]

যে বিজ্ঞান ভূতের অস্তিত্বে অনাস্থা তৈরি করেছে, সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরেই বিশ্বায়নের ভূতেদের আনাগোনা। কর্ণেন্দ্রিয়ের পরে এবার চোখের পালা, অঙ্কীয় গ্রন্থ থেকে প্রোগাম পড়ে চোখের সামনের আমটা ভ্যানিস হয়ে যেতে দেখলেন কথক, ঠিক এভাবেই লোকচক্ষুর আড়াল থেকে তার বইগুলোকে ভ্যানিশ করে রেখেছেন ভৈরব আচার্য। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির পাশাপাশি রহস্যের মোটিফ তৈরি করেছেন লেখক। পুথিটার মধ্যে বিশেষ একটি প্রোগ্রাম দেখিয়ে কথককে পড়তে বলেন ভৈরব আচার্য।

''পড়তে শুরু করলাম। কিছুই বুঝতে পারছিনা। যযাক্ষু মানে জানিনা। তবে মাথার মধ্যে ঘুরছে যযাক্ষুর জায়গায় ভৈরব আচার্যের নাম আর আবর্ত..... আবর্ত.....

''না! পারলাম না।''

''চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠলো ভৈরব ভট্টাচার্যের। টকটকে লাল চোখ করে বললেন, ''আশা ছিল তুমি পারবে।'' তাহলে তুমি থাকো আমার সঙ্গে যতদিন না প্রোগ্রামটার ভুল ধরতে পারো।''

''হঠাৎ মাথার মধ্যে চিড়িক করে উঠলো আবর্ত মানে হতে পারে 'ইনফাইনাইট লুপ'। অর্থাৎ যে প্রোগ্রাম ইনপুট নিয়ে কিছু ত্রুটির জন্য আটকে থাকে। প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে কোনো আউটপুট দিতে পারে না।''[১১]

পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে প্রযুক্তি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সেই আবর্তে গ্রস্ত হয়েছে বর্তমান প্রজন্ম। ভোগবাদী জীবন দর্শন আচ্ছন্ন করেছে তাদের মানসিকতাকে। বিশ্বায়ন পরবর্তী গল্পের আখ্যান বারবার 'রিয়ালিটি' এবং 'ইলিউশনের' মধ্যে যাতায়াত করেছে। ভূতের গল্পের সংরূপ হিসাবে আখ্যানকে ফিরতে হয়েছে 'ইলিউশনে।' 'থাকা' এবং না 'থাকার' মাঝের যে দোলাচল তার মধ্যেই নির্মিত হয়েছে একুশ শতকে ভূতের আখ্যান।

বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্পের আখ্যানে চরিত্র চিত্রণে নতুন অভিমুখ সংযোজিত হয়। জোরালো হয় নারীবাদী কণ্ঠস্বর। একবিংশ শতকের আগে গল্পে মেয়েদের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। 'শিশু-কিশোর' এই শিরোনামে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকত কিশোরীরা। আধুনিক কালপর্বে মেয়েরা গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। ভূতের গল্পে স্থান পাচ্ছে তাদের সাহস ও বীরত্ব।

কাবেরী রায় চৌধুরী গল্প 'একটি ভূতের গল্প'-তে গল্পের কথক কিশোরী। তারই বান্ধবী অলকানন্দার ডাকাবুকো সাহসী কীর্তির উল্লেখ আছে গল্পে।

''আমরা তিন বান্ধবী বরাবর ডাকাবুকো সাহসী টাইপের ছোটবেলা থেকে। বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল কলেজের শুরুতে প্রথম আলাপের দিন থেকেই। প্রথম দিন অলকানন্দা বলল, আমাকে লোকজন চমকায় খুব।
চমকায় কথাটা শুনেই বেশ পছন্দ হয়েছিল। মেয়েরা সাধারণত গুডিগুডি টাইপের হয়। 'চমকায়-টমকায়' বলে না! আমি খুব সাহসী অন্য রকম, তাই ওকে বিশেষ গুরুত্ব দিলাম।''[১২]

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পের আখ্যানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়। একবিংশ শতকে সমাজে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের আখ্যানেও তাদের কণ্ঠস্বর জোরাল হল।

যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় একুশ শতকে বৈঠকি চালের গল্পের আঙ্গিক হারিয়ে গেল। তার পরিবর্তে 'মেগাসিটি', 'হাইটেক', ছায়াময় ভূতেদের অস্তিত্ব জায়গা করে নিল। এই একবিংশ শতকেই আমরা বেশ কিছু বৈঠকী চালের গল্প পাচ্ছি। যার কথক হয়ে উঠলেন বাবা।

অরিন্দম ঘোষের গল্প 'ষ্টেশনের আতঙ্ক'-তেও তিতলিকে গল্প শোনাচ্ছে তার বাবা সৌমশেখর।

''সৌমশেখর হেসে বললেন বেশ তবে এই অন্ধকারে একটা ভূতের গল্পই হোক। ভূতের গল্পের কথা শুনে দীপ আর তিতলি দুজনেই মায়ের গা ঘেঁষে বসল।''[১৩]

বিশ্বায়নের প্রভাব কখনোই একমুখী নয়। প্রয়োজন মতো বিশ্বায়ন বিরোধী স্বরও জোরালো হয়েছে। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে গল্পের এই সরলরৈখিক আখ্যান আসলে বিশ্বায়ন বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রতিবাদেরই নামান্তর।

(খ) ভাষা ব্যবহার ঃ

বিশ্বায়ন পরবর্তী শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্পের আখ্যানে ভাষা ব্যবহার এবং বিশ্বায়িত ভূতেদের ভাষা প্রয়োগ নিয়ে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার থেকে পরিবর্তিত সমাজের প্রভাব এই গল্পগুলোতে কী প্রভাব বিস্তার করেছে তার অনুসন্ধান এই অংশের মূল প্রতিপাদ্য।

মণিলাল মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'দুখীরাম-শান্তিরাম'-এ ভূতের ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করেছেন লেখক।

> ''তা তোমার কথার মাথায় চন্দ্রবিন্দু চাপাও নি কেন? ইল্লিটারেসি, মানে নিরক্ষরতা স্যার, লেখাপড়া শিখতেই হবে, যারা শিখবেনা তাদের পস্তাতে হবে। মরে যাওয়ার পর চন্দ্রবিন্দু তাড়া করবে। যারা লিটারেট ভূত তাদের কথায় চন্দ্রবিন্দু থাকে না। তারা এক টুকরো ইলিশ মাছের জন্য ছোঁকছোঁক করে না।''[১৪]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তৈরি হওয়া ভূতের যে সংস্কার তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের ধারণা। সর্বোপরি এই যুক্তি কাঠামো নির্মাণ করছে ভূত নিজেই। ইল্লিটারেসি আসলে সমাজের অভিশাপ এই যুক্তিবাদী আধুনিক মন নিয়ে বিশ্বায়নের কালপর্বে ভূতেদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

রূপক চট্টরাজ তার 'ভূতের ভয়ে'[১৫] গল্পে বলেছেন মানুষ ভূতের কথা। মহুয়া দাশগুপ্ত তারা গল্পের নাম দিচ্ছেন ''এক ভূত-মানুষের গল্প''[১৬]। বিশ্বায়ন ভূতের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। সেকারণে ভাষার স্বাতন্ত্র্য আর নেই। ভূতেরা শিক্ষিত হয়েছে। বিশ্বায়নের হালহকিকত বুঝে নিতে তাদের শিখতে হয়েছে একাধিক ভাষা। এমন কি আধুনিক ফ্যাশনর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভূতেরা নিজেদের নাম নিজেরাই নির্বাচন করছে। 'দুঃখীরাম-শান্তিরাম' গল্পে এর উদাহরণ দিয়েছেন লেখক।

''ডং, টং, ঘং, ঢং এগুলো কিন্তু ভূতেদের নাম। দিন পাল্টাচ্ছে। ওদের রুচিও পাল্টাচ্ছে। মানুষ ঘোতা ভূত হল। ঘোতা থেকে নিজের নাম পাল্টে রাখলো ঘং। যে যেটা পছন্দ করে।''[১৭]

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ে ভূতের ভাষা ব্যবহারের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা গেছে। মৃত্যুর আগে যে ভাষায় তারা কথা বলত মৃত্যুর পরেও তারা সে ভাষাতেই কথা বলছে। রাজবংশী ভূত কথা বলেছে রাজবংশী ভাষায়, আবার সাহেব ভূত কথা বলেছে ইংরেজি ভাষায়। 'ভূশুন্ডীর মাঠে'[১৮] গল্পে সামাজিক শ্রেণি উপভাষার নিদর্শন রেখেছেন পরশুরাম, ছাপড়া জেলার ভাষার নিদর্শন কারিয়া পিরেতের উক্তিতে -

''এ বরম- পিচাস, আরে দরজা তো খোলা।''

ব্রহ্মদৈত্য শিবুর ভাষায় তার সামাজিক অবস্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে -

''মশায়ের পরিবারাদি কি?''
যক্ষের ভাষার মধ্যে রয়েছে প্রাচীনত্বের ছাপ -

''আমার নাম নদের চাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে।'' লিঙ্গ অনুসারে ভাষা ভেদের দৃষ্টান্তও রয়েছে গল্পে। ডাকিনী নেত্যকালী বলে, ''ওলাউঠো শত্তুরের হোক। কেন ঘরেকি কেরোসিন ছিল না?''

শাকচুন্নীর উক্তি, ''আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতিরবয়সী।''
সামাজিক শ্রেণি চরিত্রের এই ভিন্ন অবস্থা বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে দূর্লভ নয়।

আশাপূর্ণা দেবী 'পরলোকের হাড়ির খবর' গল্পে ভূতেদের সানুনাসিক স্বরের উল্লেখ করেছেন। মানুষ মরে ভূত হলে সে খোনা কথা বলে।

''ভাবতে ভাবতেই গজগোবিন্দ একদম সামনে এসে গেল, আর চেঁচিয়ে উঠলো, কেঁ বঁটা নাঁ?

বটকেষ্ট শিউরে উঠলো। চমকালো খানিকটা আহ্লাদে, খানিকটা দুঃখে। বলল, তুঁইও চঁলে এঁলি?

তাঁ তোঁ এঁলুম। যঁমের মুঁখে থাঁকা তো? কিন্তু তুঁই কঁবে?

সেঁই উঁল্টো রঁথের দিঁন। তুঁই দেঁশে না থাঁকাতেই আঁমার এঁই বিঁপত্তি। তোঁর ওঁষুধ এঁক দাঁগ পঁড়লেই ঠিঁক সেঁরে যেঁতুম।''[১৯]

অধ্যাপক উদয় কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থের ''ভূতের ভাষা'' শীর্ষক প্রবন্ধে ভূতের সানুনাসিক ধ্বনি ব্যবহারের ভাষাতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে সাধারণভাবে ভূতেদের ভাষায় দুটি মাত্রা যোগ হয় একটি খোনা গলা, অপরটি আনুনাসিক স্বর, কথা বলবার সময় ঠোঁঠ কাটা থাকার জন্য সব ধ্বনি স্পষ্ট বোঝা যায় না। নাক দিয়েও কিছুটা বাতাস বেরিয়ে যায় সে কারণে সানুনাসিক স্বরও যুক্ত থাকে। খোনা গলায় কথা বলবার সময় গলবিলের ওপর চাপ পড়ে। ওষ্ঠ্য ধ্বনিগুলি যেমন প, ফ, ব যথাযথ উচ্চরণ করা যায় না। হঁ জাতীয় ধ্বনি, যেসব ধ্বনির উচ্চারণ করা যাচ্ছে না সেখানে বসে।

আনুনাসিক সুরে কথা বলার সময় সমস্ত স্বরধ্বনি সানুনাসিক ধ্বনি হিসাবে উচ্চারিত হয়। মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাসবায়ু নির্গমনের জন্য এই ধ্বনিগুলি মৌখিক ও নাসিক্য ধ্বনি হয়। বর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করেই তৈরি হয় ভূতেদের সংলাপ। লোকবিশ্বাসে সবধরণের অপদেবতার ভাষাই সানুনাসিক।

স্বাভাবিক মানুষের আচার-আচরণ থেকে আলাদা করবার জন্য ভূতেদের উপর এই বাড়তি বৈশিষ্ট আরোপ করা হয়েছে। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ে ভূতেদের শরীরী উপস্থিতি প্রত্যক্ষ হলেও সীমা অসীমের ভেদকে তারা অতিক্রম করতে পারেনি। সে কারণে মানুষ দূর থেকেই দেখেছে ভূতকে। কখনো ভয় পেয়েছে। আবার কখনো ভূতের দ্বারা

উপকৃতও হয়েছে। একবিংশ শতকে এসে ভূতেদের শরীরী উপস্থিতি আর থাকল না। ছায়াময় অস্তিত্ব নিয়ে তারা মিশে গেল মানুষেরই সমাজে, তাদেরই একজন হয়ে। সেকারণে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ধ্বনিবর্ণ সহযোগে ভাষা তার গুরুত্ব হারাল। সানুনাসিক ধ্বনি প্রয়োগে ভূতকে পৃথক করার প্রয়োজন বর্তমান সময়ে এসে ফুরিয়েছে। পেত্নী, শাকচুন্নী, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণি চরিত্রের নির্মোক খসে গিয়ে তারা কেবল ছায়াময় অস্তিত্বে পরিণত হল। সেকারণে একবিংশ শতকের ভূতের ভাষা কেবল তার অস্তিত্বের দ্যোতক, 'থাকা' এবং 'না-থাকার' যে সংশয় তারই বাঙ্ময় রূপ।

রূপক চট্টোরাজের গল্প, 'বিপিনবাবুর ঠিকানা' গল্পে ভূতেদের উপস্থিতি অস্তিত্বের মধ্যে অনুভব করার মতো। ভূতেদের ভাষায় আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্যের আরোপ সেখানে নেই।

> ''আমাকে অবাক করে, আমার হাতের সামান্য ঠেলাতেই কাঠের দরজার পাল্লাটা খুলে গেল। সেই মুহূর্তেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একরাশ বিচ্ছিরি গন্ধ। ভেতরের অন্ধকারে বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।''[২০]

বিশ্বায়নের কালপর্বে ভূতের ভাষাকে অস্তিত্বের রূপক হিসাবে পড়তে হবে। সেকারণে ঘরের ভেতরের বিচ্ছিরি গন্ধও অশরীরী উপস্থিতির সূচক হয়ে ওঠে।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের গল্প, ''আমি আছি ভেতরে'' গল্পে কথক খড়দা থেকে দু-তিন কিলোমিটার ভেতরে পুরনো বাড়ি কিনেছেন কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। নতুন বাড়িতে আসবার পরই অশরীরী নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে।

> ''প্রতিদিন রাত দশটায় আমি একটা শব্দ পাই, একটা দরজা বন্ধের শব্দ। দরজাটা বন্ধ হবার আগে একটা অস্তিত্বের যেন জানান দেয় - আমি আছি, বাতাস বইতে থাকে। ঘরে আলো যেন কেঁপে ওঠে। তারপর দরজায় কব্জায় একটা হালকা

> আওয়াজ, কেউ যেন অতি সন্তপর্ণে দরজা দিচ্ছে। তারপর দরজা পড়ার শব্দ সুনিশ্চিত হলে আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কাকাবাবুর ঘরটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরে কেউ যেন জানলা খোলে। একটা গন্ধ। বেলফুলের মতো একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে।''[২১]

শব্দ, গন্ধ ইন্দ্রিয়ের এই অনুভূতিগুলোই বিশ্বায়নের কালপর্বে ভূতেদের উপস্থিতির চিহ্ন হয়ে উঠেছে। উপরের উদ্ধৃতাংশে বারবার 'যেন' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'যেন' সংশয়সূচক শব্দ। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের যে দোলাচল তাই গল্পের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আনুনাসিক স্বর ব্যবহারের যে সংস্কার এতদিন পর্যন্ত ভূতেদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে ছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বারেবারে ভূতেরা সেই সংস্কারকে নাকচ করেছে। নিজেদের মতো যুক্তি সাজিয়ে সানুনাসিক স্বর ব্যবহার না করার কারণ ব্যাখ্যা করেছে।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'অদৃশ্যের মন্ত্রণা' গল্পে গল্পকথক ছায়াময় অস্তিত্বকে যখন প্রশ্ন করে ভাষার এই পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব হল তখন অশরীরী তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।

> ''আচ্ছা, আপনি তো নাকি সুরে কথা বলছেন না? সন্ধ্যের অন্ধকার বলে উঠল, ''সব ভূত বলে না। যারা বেঁচে থাকতে লেখা বা বলার সময় চন্দ্রবিন্দু প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেনি অথবা ভুল জায়গায় করেছে, সেই চন্দ্রবিন্দুগুলো মৃত্যুর পর তাদের নাকে এসে জমা হয়।''[২২]

বর্তমান সময়ে ভূতেরা যে পরিমাণ আধুনিক হয়েছে তাতে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের প্রয়োজন যে ফুরিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গৌরী দে এর গল্প ‘ডিসেকশন রুমে’ মিলনের বিশ্বাস এবং অনুভূতির যে দোলাচল তার মাঝেই ধরা পড়েছে ভূত। স্পষ্ট হয়েছে ভূতের ভাষা।

> ‘‘গভীর রাত। ঘড়িতে প্রায় রাত দুটো বাজে, অন্ধকার ঘরে দুজনেই ঘুমে অচেতন। হঠাৎ মিলনের ঘুমটা কিসের একটা অস্বত্বিতে ভেঙে গেল। তার মনে হল ঘরের মধ্যে একটা কালো ছায়া তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে ওঠে মিলন, কে, কে ওখানে।’’[২৩]

মানুষের মনের জমাট বাঁধা অন্ধকার বারবার মুখোমুখি করছে ভূতেদের সঙ্গে। অস্তিত্বের দোলাচলে ভুগতে থাকা মানুষের কাছে ভূতেরা আসে ছায়াময় হয়ে। সেকারণে সরাসরি ভাষা ব্যবহারের বদলে কেবলমাত্র উপস্থিতি এই সময়পর্বে অনেক বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়নে ভূতেদের যাত্রা আসলে ভয় থেকে অস্বস্তির দিকে। সেকারণে ভাষা ব্যবহারও তার পুরনো আদল ছেড়ে ইন্দ্রিয় নির্ভর হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র কর্ণেন্দ্রিয় নয় সমস্ত অস্তিত্ব দিয়েই ভূতেদের কথা শুনতে হয়। শিশু-কিশোর গল্পে ভূতেদের ভাষা ব্যবহারের এই পরিবর্তন সময়ের বিবর্তন মেনেই। কারণ যেসব শিশু-কিশোরদের সঙ্গে ভূতেরা সানুনাসিক স্বরে কথা বলত বিশ্বায়নের কালপর্বে তারাও তো বদলে গেছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাল্টে নিয়েছে নিজেদের অভিরুচি, বদলে ফেলেছে নিজেদের ভাষা।

পীযূষকান্তি সরকারের গল্প ‘‘ভৌতিক সম্মেলনে অষ্টদা’’ গল্পে ভূতেদের ভাষা প্রয়োগের ধরণটি বর্তমান সময়কে প্রতিফলিত করে।

> ‘‘আগামী শুক্রবার অমাবস্যা, ওই দিন রাতে আমাদের বিশেষ মিটিং আছে।
> আপনাদের ও মিটিং হয় নাকি?
> হয় না আবার, বলেন কি! মিটিং-ইটিং সবই হয়।
> তবে এতদিন যা হয়েছে সবই জেলা ভিত্তিক, মানে

এই হাওড়ার মধ্যেই, কিন্তু এটা হল গিয়ে স্পেশাল মিটিং।''[২৪]

'মিটিং-ইটিং' শব্দটি একেবারেই হাল আমলের আমদানি। একই ভাবে এই গল্পে 'হেব্বি', 'ব্যাপক' প্রভৃতি শব্দ বন্ধগুলিও রয়েছে। যা একেবারে আধুনিক বাচন ভঙ্গিতে উঠে এসেছে। আর এই শব্দের বক্তা কেবল মানুষ নয়, বর্তমান সময়ে ভূতেদের ও অভিধানের কলেবর বেড়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভূতেদের এই মিটিং এর মূল্য উদ্দেশ্য ভয় পাওয়ানোর নতুন তারিকা আবিষ্কার। মানুষেরা আর ভূতেদের ভয় পাচ্ছে না। সেকারণে হাওড়া ও কলকাতার ভূতেরা যৌথ সম্মেলনের ডাক দিয়েছে।

ভূতেদের প্রবীণ নেতা মিহির কুমার প্রথমে বক্তৃতা করলেন। পরিবর্তিত সময়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে তার ভাষ্য ব্যবহারে।

> ''ভাইসব, মানুষ আমাদের ভয় পায় না কেন জানেন! ওই সব লেখক যারা ভূত কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, হাসি-ঠাট্টা করে তাদের জন্য। সেদিন ক্লাস নাইনের দুটো ছেলেমেয়ে বলাবলি করছিল বাবা কাকারা কতসব ভূতের ভয়ের গল্প বলত। ওফ্ যদি একটা ভূতকে পেতাম না! রোজ আমার বইয়ের ব্যাগটা বইতে নিতাম। কম্পিউটারে টাইপ করিয়ে নিতাম। কত কী যে করতাম না কী বলব!''[২৫]

বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে এইভাবে ভূতেদের মাধ্যমে উঠে এসেছে সমসাময়িক সময়ের সামাজিক সত্য। ভূতেদের সঙ্গে দেখা হলে কম্পিউটারে টাইপ করিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ বিশ্বায়নের আগে আসেনি। প্রযুক্তি কেবলমাত্র বড়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আর। সীমানা বৃদ্ধি করতে সে কিশোর-কিশোরীদেরও নিজের আওতায় নিয়ে এসেছে। সেকারণে ভূতেদের নিজেদের কর্মসূচি পাল্টাতে হয়েছে।

> ''এই শতকে আমাদের কলকাতার ভূতেদের কর্মপদ্ধতি অনেক বদলে ফেলতে হয়েছে। এখন আর পুরনো দরজার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ, জিভ ভ্যাঙানি নয়। সর্বাধুনিক রীতির প্রয়োগ করতে হবে। যে-সব ছেলে মেয়েরা ভূত নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে

> সেখানে সশরীরে গেলে হবে না। শরীর অদৃশ্য রেখে কষে দুটো কান মলে দিয়ে চলে যাও। কিংবা শরীর লুকিয়ে ঠ্যাং বাড়িয়ে ল্যাং দাও। দ্যাখো ভয় পায় কিনা! মোট কথা যুগের তালে তাল দিয়ে কর্মপদ্ধতির সংশোধন করলে মানুষ ভয় পেতে বাধ্য।''[২৬]

'ঠ্যাং বাড়িয়ে ল্যাং দাও' এই সংলাপ ভূতের গল্পে একেবারে সাম্প্রতিক আমদানি। মিহির কুমারের গোটা বক্তব্যের মধ্যে সময়ের প্রতিচ্ছবি রয়েছে। টি.ভি. সোশালমিডিয়ার দৌলতে বক্তৃতার এই বাচনভঙ্গির সঙ্গে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পরিচিত। সেকারণে ভূতের ভাষা এই আদর্শটিকে গ্রহণ করে নিজেদের সংলাপ তৈরি করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়িত হয়েছে ভৌতিক অস্তিত্ব। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের মতো কেবল সংস্কার বশে এ প্রজন্মের শিশু-কিশোররা নির্বিবাদে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হল না। যুক্তি ও প্রতিযুক্তি নির্মাণ করে ভৌতিক আবহকে অস্বীকার করতে চাইল।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গল্প 'বাইশে শ্রাবণ' এর কেন্দ্রিয় চরিত্র নন্দবাবু প্রসঙ্গে কথক যে মন্তব্য করেন সেখানে কুসংস্কার ও আধুনিকতার পরস্পর বিরোধী অবস্থান চিহ্নিত করা রয়েছে।

> ''কদিন ধরে এ এক রোগ হয়েছে নন্দ গোপালের, মনের মধ্যে কেবলই 'কু' গাইতে থাকে। এক শালিক দেখলে দিন ভালো যাবেনা, গাড়ির সামনে বিড়াল পার হলে অশুভ কিছু ঘটবে কিংবা বেরোবার সময় টিকটিকি টিকটিকি করলে বিঘ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়ে এসব মেনে চলা হাস্যকর সেও বোঝে। কিন্তু মনকে মানাতে পারে না।''[২৭]

আধুনিকতা এবং কুসংস্কারের এই টানা পোড়েন বিশ্বায়ন পরবর্তী' সমাজের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্টারনেট মানুষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিল ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরের বদ্ধমূল সংস্কারকে একেবারে উপড়ে ফেলতে পারল না। সে কারণে এত যুক্তি খাড়া করেও শেষ পর্যন্ত ছায়াশরীরদের মুখোমুখি হয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ে

বর্তমান প্রজন্ম। প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষের বোধ তার মনের সংশয়কে জোরাল করে তোলে।''

বিশ্বায়নের চিহ্ন স্বরূপ পুঁজিবাদী সমাজের ভাষা এবং প্রযুক্তির ভাষা উভয়েই স্থান পেয়েছে এই সময়ের গল্পে। পিনাকী ঘোষের গল্প 'কাঁটাতার'-এ গল্পের কথক গল্পের শুরুতে নিজের যে পরিচয় দিয়েছে তার মধ্যেই ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> ''আমি দিশা। দিশা দত্ত। পড়ি অক্সিলিয়াম কনভেন্টে, ক্লাস টেনে। এই শীত পেরোলেই ফেব্রুয়ারীতেই আমার আই. সি. এস.ই পরীক্ষা শুরু। তাই খুব চাপ। আমার বোন ঈশানীর লাইফ অবশ্য বিন্দাস। ও পড়ে আমারই স্কুলে, ক্লাস ফাইভে। আমরা স্বভূমি নামে একটা হাউজিং কমপ্লেক্স-এ থাকি। আমাদের কমপ্লেক্সের ভেতরেই খেলার জায়গা আছে।''[২৮]

যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে 'ফ্ল্যাট কালচার' তৈরি হয়েছে আধুনিক সময়ে। বিশ্বায়নের আগে শিশু-কিশোর সাহিত্যে পুঁজিবাদী সভ্যতার আগ্রাসন লক্ষ করা যায়নি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই ভূতের গল্পে উঠে আসে 'লাইফ বিন্দাস' এর মতো শব্দবন্ধ। বর্তমান প্রজন্মের ভাষা প্রয়োগ যেভাবে বদলেছে গল্পগুলোর মধ্যে তার উপস্থিতি এবং প্রয়োগ বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে।

সৌরভ কুমার ভুঁইয়ার গল্প 'মাঝরাতের কল-এ পাপাই আর পিঙ্কি কম্পিউটারে ভিডিও গেম খেলতেই ব্যস্ত। কারেন্ট চলে যেতে তারা মামার কাছে গল্প শোনার আবদার জানায়।

> ''কম্পিউটারে মজার খেলা খেলছিল তারা। কারেন্ট চলে যেতে কম্পিউটার বন্ধ। পাপাই আর পিঙ্কি এবার ঋতব্রত কে জড়িয়ে ধরে বলে, 'মামা একটা গল্প বলো।'[২৯]

বাইরে অন্ধকার জমাট বাঁধলে, সেই অন্ধকারে হারিকেনের মৃদু আলোয় বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী সময়ে জমে উঠত ভূতের গল্পের আসর। বর্তমানে গল্পের জায়গায় এসেছে ভিডিওগেম। কারেন্ট না থাকায় কম্পিউটার বন্ধ, তাই ভূতের গল্পের আয়োজন। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সে কারণে ভূত উঠে এসেছে ভিডিও গেমে। একাধিক 'ঘোস্ট হান্টিং' ভিডিওগেম বর্তমান প্রজন্মের নিত্যসঙ্গী । চারিপাশে বিভিন্ন মাল্টিপ্লেক্স শপিং-মলে 'হরর হান্ট' বা গোস্ট হাউজ নামে আলাদা জায়গা থাকে। সেখানে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অর্থের বিনিময়ে ভয় দেখানোর খেলা উপভোগ করে। পুঁজি মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে মানুষের 'ভয়'কে নিয়েও ব্যবসা ফেঁদে বসেছে বিশ্বায়নের সমাজ।

সায়ন্তনী পলমলের 'মিতুল' গল্পেও আধুনিক ফ্ল্যাট সংস্কৃতির ছবি এঁকেছেন লেখক।

> ''এখানে সবাই খুব চুপচাপ, যে যার মতো থাকে, বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বললেও তার মতো আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ দেখায়নি কেউই। সেও যেচে কারোর সঙ্গে আলাপ করেনি। কী লাভ! কদিনই বা সে থাকবে এখানে।''[৩০]

বিশ্বায়নের সামাজিক অর্থনৈতিক বিবর্তনের চিহ্নগুলো শিশু কিশোর পাঠ্য গল্পের ভাষার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরিবর্তনের চিহ্ন যদি ভাষার মধ্যে ধরা না পড়ে তাহলে গল্প তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত আলোচনা করবার সময় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের যে স্বর গল্পের আখ্যানে লক্ষ করা গেছে, ভাষায় তারও প্রভাব পড়েছে। ডিজিটালাইজেশনের বিরোধী কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে একুশ শতকের গল্পের ভাষায়।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্প 'ভূতরা ভূতের গল্প লিখছে' গল্পে লেখিকা জানিয়েছেন এখানকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মোটে বই পড়ে না। ভূতের গল্পের প্রতি তাদের অনীহা। সেকারণে ভূতেরাই ভূতেদের গল্পের লেখক এবং পাঠক।

> ''ভূতেরা ওয়ার্কশপ করে লিখছে। লেখা ছাপানো, বাইন্ডিং সব ওদের কাজ, সব হয়ে গেলে প্যান্ডেল ঘিরে বইমেলা করব। উদ্বোধন হবে ভূত-চর্তুদশী রাতে। উদ্বোধন করবেন ড্রাকুলা।''[৩১]

গল্পের মধ্যে যেসব বিদেশি শব্দ রয়েছে, কেবল ইংরেজি শব্দ বলে তারা গল্পে স্থান পেয়েছে, এমন টা নয়। সামগ্রিক জীবন যাপন ও বোধের সঙ্গে শব্দগুলো ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। গল্পে ভূতের ভাষা এবং আখ্যানের ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন তার প্রভাব বিস্তার করেছে। শরীরী অস্তিত্বের বদলে এই শতকের ভূতেরা হয়েছে ছায়াময়। সেকারণে তাদের ভাষা সংকেতের ভাষা। উপস্থিতি দ্যোতক, ব্যঞ্জনাময়, ইন্দ্রিয় নির্ভর ভূতের এই ভাষা, শিশু-কিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পে বিশ্বায়নের নির্মাণ।

(গ) চিত্রকল্প

ভূতের গল্পে বিশ্বায়নের কালপর্বে চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ার মতো, গল্পের মধ্যে যে ছবি তৈরি করছেন লেখক তার মাধ্যমেই প্রতিভাত হয় একুশ শতকের সমাজের চালচিত্র। আবার কখনো এই সব চিত্রকল্পে ধরা পরে মনের গভীরতম অভিব্যক্তি। একুশ শতকে এসে ভূত কেবলমাত্র সংলাপের ঘেরাটোপে আটকে থাকল না। মুখের ভাষা অপেক্ষা অস্তিত্বের ভাষা মুখ্য হয়ে উঠল। আর এখানেই একুশ শতকের চিত্রকল্পের অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। আখ্যানের বর্ণনার মাঝে মাঝে চিত্রকল্প বর্তমানে সময়ের আভাস দেয়। বিশ্বায়নের সময়ে বর্তমান প্রজন্মের চারিপাশকে দেখার যে বদল ঘটল, সেই বদলের ইঙ্গিত ধরা পড়ল গল্পের চিত্রকল্পের মধ্যে।

শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প 'সুন্দরবনের ভূত'-এ সুন্দরবন বেড়াতে এসেছেন কথক। সেখানে এসে সুন্দরবনের রূপ কথককে মুগ্ধ করেছে।

> ''আমাদের নৌকা চলেছে। বিকেলের সোনারোদ
> নির্মল পরিবেশে গাঢ় হলুদ রঙ ধরেছে। গড়ান, কেওড়া,
> হেঁতাল গাছের ঘন জটলা, হলুদ-সবুজ রঙে মাখামাখি।
> নদীর জলেও হলুদ-লাল আভা।''[৩২]

বিশ্বায়নের অনেক ভূতের গল্পে প্রকৃতির অনুষঙ্গ এসেছে। কিন্তু রঙে সৌন্দর্যে মিশিয়ে এমন কাব্যিক চিত্রকল্প লক্ষ করা যায়নি। কথক কলকাতা শহরের মানুষ। আধুনিক শিক্ষিত মন নিয়ে সে দেখে প্রকৃতির এই রূপ। রঙ আসলে বিমূর্ততার ধারণা তৈরি করে। গাছের রঙ আর সূর্যের রঙ মিশে যে জটিল রহস্যের আবহ তৈরি করেছে, নাগরিক মন ছাড়া এই উপলব্ধি সম্ভব নয়, আধুনিক শহুরে কায়দায় মানুষ হওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে এই ছবি ধাক্কা দেয়। প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে জীবন তারা যাপন করে সেখানে বাহারি রঙের এমন মিশেল নেই।

গল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি নাগরিক সভ্যতার প্রতি কথকের আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

> ''মনে পড়ছে আলো ঝলমল কর্মব্যস্ত কলকাতার কথা।
> মনটা ঘরে ফেরাব জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।''[৩৩]

বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে নগর এবং তার জীবনযাত্রা ভূতের গল্পের মধ্যে বারবার স্পষ্ট হয়েছে। বেশির ভাগ ঘটনারই সংঘটন স্থল শহর কিংবা শহরতলী। এর পাশপাশি গ্রামের বদলে যাওয়া যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তার রূপকল্পও স্পষ্ট হয়েছে এই পর্বের গল্পে।

মহুয়া চক্রবর্তীর গল্প ‘‘একটা ভূত পাখির গল্প’তে আধুনিক ‘ফ্ল্যাট কালচারের’ ছবি উঠে এসেছে।

> ‘‘কিম্ভূত আবাসনে ছটা ব্লক, প্রথম ব্লকের দোতলায় শপিং কমপ্লেক্স, ওরা থাকে সি কমপ্লেক্স-এ মা চলে গেলে বসার ঘরে জমিয়ে বসে টি ভি খোলে। মাইক্রোয় ভাত আর গ্যাসে চিকেন ঝোল! রিমোর্ট টিপে দ্রুত চ্যানেল পাল্টাতে থাকে অন্তু।।’’[৩৪]

একেবারে আধুনিক জীবন যাপনের ছবি ধরা পড়েছে এই গল্পে। ‘হাইটেক সিটি’তে বড় হওয়া এই প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। রিমোর্ট টিপে দ্রুত চ্যানেল ঘোরাতে থাকে অন্তু, কারণ বিশ্বায়ন তাদের হাতের সামনে এত নানাবিধ প্রলোভন তৈরি করেছে যে তারাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে কোথায় মনোনিবেশ করবে, রকমারি এই প্রলোভন তাদের পুঁজিবাদী মানসিকতাকে গ্রস্ত করে।

এই সময়ের গল্পে সোশাল মিডিয়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়। গল্পে উঠে আসে প্রযুক্তির বহুমাত্রিক চিত্রকল্প। ঋতা বসুর গল্প ‘ডুয়েল সিমেট্রি’-তে এসেছে ভূতেদের ‘ফেসবুক’ ব্যবহার চিত্রকল্প।

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ‘অঙ্কীয় গ্রন্থ’ ভৈরব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথকের আলাপ হয় ফেসবুকের মাধ্যমে তার কাছে কথক এসেছেন দুষ্প্রাপ্য বই দেখাবার আশায়।

> ‘‘ভৈরব ভট্টাচার্যকে আমি চোখে দেখিনি, আলাপ ফেসবুকে। তাই ওর কিছু ছবি দেখেছি। ভদ্রলোকের শখ পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা। ফেসবুকে ওঁর বন্ধুবৃত্ত বেশি নয়। মাত্র শ-খানেকের কাছাকাছি। উনি ফেসবুককে খুব একটা নিয়মিত নন। তবে পুরনো বইপত্র পড়লে ফেসবুকে সেই লেখা নিয়ে আলোচনা করে স্টেটাস আপডেট দেন।’’[৩৫]

ফেসবুক মানুষকে বিশ্বায়িত করেছে, ভৌগোলিক সীমানার ভেদ মুছে দিয়ে মানুষের বন্ধুবৃত্তকে করে তুলেছে 'গ্লোবাল'। আর এই গ্লোবালাইজেশনের হিড়িক এসে পড়ছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উপর। বিশ্বায়নের আগে ভূতের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগে কোনো সোশাল মিডিয়ার প্রয়োজন পড়ত না। আধুনিক সময়ে ফেসবুক তাদের যোগাযোগের মাধ্যম। বিশ্বায়নের ভূত ধরা দিয়েছে ফেসবুকে।

এই সময় পূর্ব থেকেই ভূতের গল্পে 'মৃত্যু' এবং 'হত্যা' এই দুই চিত্রকল্পের অতিমাত্রায় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মৃত্যুর এই বীভৎস রূপ বিশ্বায়নের আগে পরিলক্ষিত হয়নি। ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'মোহনপুরের মোহনবাবু' গল্পে 'খুন' এর প্রসঙ্গ উঠে আসার সঙ্গে মূর্ত হয়ে ওঠে বীভৎস চিত্রকল্প।

> ''খানিকদূর এগিয়ে এসে একটা চৌমাথার মোড় আছে। সেখান পর্যন্ত আসতেই দূর হেডলাইটের আলোয় দেখি জনা চার-পাঁচ ছেলে হাতে রঙ-ছোরা, সাইকেলের চেন ইত্যাদিতেও সশস্ত্র হয়ে, দৌড়ে এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল''[৩৬]

শিশির বিশ্বাসের গল্প 'জিরো পয়েন্ট'-এ একইভাবে ধরা পড়েছে মৃত্যুর ছবি। খুনের বদলে এখানে এসেছে 'অ্যাক্সিডেন্ট' এর প্রসঙ্গ। বেপরোয়া জীবন-যাপনে প্রায় ঘটে যায় দুর্ঘটনা, মৃত্যু তার মর্মান্তিক পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়।

> ''ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে পাহাড়ি পথে তখন গাড়ি ছুটছে। আমাদের কারো কথা বলবার মতো অবস্থা ছিল না। সামনেই অতল খাদ, জিরো পয়েন্ট।''[৩৭]

শিশির বিশ্বাসের অন্য একটি গল্প 'লাশঘরে'তে মর্গ, পোস্টমর্টেম- এর চিত্রকল্প গুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ে মৃত্যুর পরে ভূত দশাই শিশু-কিশোরদের কাছে একমাত্র সত্য ছিল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তি করেছে। মৃত্যুর পর মানুষের আর কোনো অস্তিত্বই থাকে না। মৃত্যুর পরে মানুষের

শরীরটা অস্থিচর্মসার মাত্র। বিশ্বায়নের আধুনিক ধারণার বিপ্রতীপেই গড়ে উঠেছে ভূতের গল্প। ব্যবহার করেছে, পোস্টমর্টমের মতো মোটিফ।

> ''বড় একটা সিরিঞ্জ রেডি করে বোতল থেকে অনেকটা ফর্মালিন নিয়ে একটু পরে জোসেপ বডির বিভিন্ন স্থানে পুশ করতে শুরু করল। তারপর কী একটা ওষুধ বডি উপর স্প্রে করে শুরু করল ম্যাসাজ। ঔষধের গন্ধ তো ছিলই। এবার লালের উপর জোসেফের সরু দুটো হাত দ্রুত চলতেই গা গুলিয়ে উঠল গোবিন্দের।''[৩৮]

ভূতের গল্পে ভয়ানক রস অপেক্ষা অদ্ভুত রসের আয়োজনই বেশি ছিল শিশু-কিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পে। 'জুগুপ্সা' রসের চিত্রকল্প এর আগে লক্ষ করা যায় না। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বীভৎস রসের আয়োজনও পরিলক্ষিত হল। বিভিন্ন 'ঘোস্ট গেম'এর হাত ধরে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে 'মৃত্যু', 'হত্যা' এগুলো অপরিচিত নেই আর। শুধু তাই নয়, মৃত্যু কতটা নির্মম আর পাশবিক হতে পারে এই গেমগুলোর মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পাশাপাশি মিডিয়ার দৌলতে সামাজিক সন্ত্রাসের ছবি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের পর সামাজিক পরিস্থিতির যে বদল তা ভূতের গল্পের চিত্রকল্পকেও আমূল বদলে দিয়েছে।

বিশ্বায়নের পরবর্তী ভূতের গল্পে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে তন্ত্রের রূপকল্প। তন্ত্র তার গূঢ় রহস্যজাল নিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ভূতের গল্পে। বিশেষত ২০১০ সালের পর থেকে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়।

শিশির বিশ্বাসের গল্প 'ঘন ডালের অন্ধকারে'- এ তন্ত্রের আর্কেটাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। ধনঞ্জয় বাবুর খাস বেয়ারা জলধর ভট্ট তন্ত্র চর্চা করেন। কথকদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের গাছে অশরীরীদের আস্তানা, ধনঞ্জয় বাবুর হলুদ পোড়ায় কাজ হয় অবশেষে।

''জলধর ভট্ট ধনঞ্জয়বাবুর খাস বেয়ারা ছিলেন। কপালে মস্ত টিন, লম্বা ঘাড় ছাপানো চুল। মানুষটি নাকি তন্ত্রচর্চা করেন।''[৩৯]

''কথা শেষ করে জলধর ভট্ট কাঁধের ঝুলি হাতড়ে কী একটা বের করে ধনঞ্জয়বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'সামান্য পুড়িয়ে নিয়ে ঘরে রাখবেন।'[৪০]

তন্ত্রের প্রতি অজানা আকর্ষণ থেকে একধরণের কৌতূহল তৈরি হয়। সেই কৌতূহলকে অবলম্বন করে চিত্রকল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তন্ত্রের প্রসঙ্গ।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের গল্প 'সাইক্লিস্ট' এ চিত্রকল্পের মাধ্যমে রিয়ালিটি ও ইলুইশনের ধারণাটি স্পষ্ট হয়েছে। ছবির সঙ্গে বাস্তবের যে ফারাক সেই ব্যবধানই গল্প কথকের মনে অস্বস্তি তৈরি করেছে। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সাইক্লিস্ট স্থির, কিন্তু বাস্তবে এগিয়ে আসছে। আবার বাস্তবে তাকে দেখতে পারছেন না কথক, অথচ মনে হচ্ছে ছবির মধ্যে সাইক্লিস্ট গতিশীল।

''ছবির সেই সাইক্লিস্টের চাকা দুটো যেনো ধীর গতিতে ঘুরছে। তাছাড়া, সে যেন আর আগের জায়গায় নেই। আকারে যেন বড় হয়েছে ছবির সেই সাইক্লিস্ট। এ কি ময়ূখের দৃষ্টি বিভ্রম? নাকি আলো ছায়ার খেলা?''[৪১]

ইলিউশন ও রিয়েলিটির মাঝে ভূতের গল্প বারবার যাতায়াত করেছে। মানুষের মনের অন্ধকারময় যে দিক তারই জমাট বাঁধা রূপ হলো বিশ্বায়নের ভূত। একুশ শতকে গল্পের চিত্রকল্পেও বর্তমান সময়ে মানুষের অস্তিত্ব এবং না-অস্তিত্বের মাঝের যে দোলাচল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। গুহ, জীবনময়, ‘বেহ্মদৈত্য’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ১৯২

২। চন্দ, শাশ্বতী, ‘দৈত্যের বাগানে কিছুক্ষণ’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, চৈত্র ১৪২৪, পৃষ্ঠা ৫২

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫

৫। পাঠক, শোভন, ‘নো নম্বর ডাকছে’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, মাঘ ১৪২১, পৃষ্ঠা ৫

৬। চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, ‘লেখকভূত’ শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৮, পৃষ্ঠা ১২

৭। রায়, অনুপম, ‘অশরীরীদের আস্তানায়’’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২২, পৃষ্ঠা ৩৪

৮। বন্দ্যোপাধায়, তমাল, ‘সহযাত্রী’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা ১০

৯। মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, ‘অঙ্কীয় গ্রন্থ’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা ১০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ১২

১১। তদেব

১২। রায় চৌধুরী, কাবেরী, ‘একটি ভূতের গল্প’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৩২

১৩। ঘোষ, অরিন্দম, ‘স্টেশনের আতঙ্ক’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২১, পৃষ্ঠা ৫৩

১৪। মুখোপাধ্যায়, মণিলাল, ‘দুঃখীরাম শান্তিরাম’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২৭৮

১৫। চট্টরাজ, রূপক, ‘ভূতের ভয়ে’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪০২, পৃষ্ঠা ১২

১৬। দাশগুপ্ত, মহুয়া, ‘এক ভূত-মানুষের গল্প’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২, পৃষ্ঠা ৫১

১৭। মুখোপাধ্যায়, মণিলাল, ‘দুঃখীরাম শান্তিরাম’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২৭৬

১৮। বসু, রাজশেখর, ‘ভুশুন্ডীর মাঠে’, বসু, দীপঙ্কর, (সম্পা.), এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, কলকাতা, অক্টোবর ২০১০, পৃষ্ঠা ৯০-১০০

১৯। দেবী, আশাপূর্ণা, ‘পরলোকের হাড়ির খবর’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৯৩৯, পৃষ্ঠা ২৬

২০। চট্টরাজ রূপক, ‘বিপিনবাবুর ঠিকানা’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৪৫

২১। মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত, ‘আমি আছি ভেতরে’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২২, পৃষ্ঠা ৪৫

২২। গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘অদৃশ্যের মন্ত্রণা’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১৫, পৃষ্ঠা ২৮

২৩। দে, গৌরী, ‘ডিসেকশন রুমে’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৪৭

২৪। সরকার, পীযূষকান্তি, ‘ভৌতিক সম্মেলন অষ্টদা’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪২১, পৃষ্ঠা ৪৪

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬

২৬। তদেব

২৭। রায়, কৃষ্ণচন্দ্র, ‘বাইশে শ্রাবণ’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, চৈত্র, ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৩২

২৮। ঘোষ, পিনাকি, ‘কাঁটাতার’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২১, পৃষ্ঠা ৮

২৯। ভুঁইয়া, সৌরভ কুমার, ‘মাঝরাতের কল’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৫

৩০। পলমল, সায়ন্তনী, ‘মিতুল’ শুকতারা, দেব সাহিত্যে কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৫।

৩১। দেবী, মহাশ্বেতা, ‘ভূতেরা ভূতের গল্প লিখছে’, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, মাঘ ১৪২১, পৃষ্ঠা ৬০

৩২। রাজগুরু, শক্তিপদ, ‘সুন্দরবনের ভূত’, আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৪৩২

৩৩। তদেব

৩৪। চক্রবর্তী, মহুয়া, ‘একটা ভূত পাখির গল্প’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, মাঘ ১৪২২, পৃষ্ঠা ১৪৪

৩৫। মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু, ‘অঙ্কীয় গ্রন্থ’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা ৯

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল, ‘মোহনপুরের মোহন বাবু’, শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কার্তিক ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৪০

৩৭। বিশ্বাস, শিশির, ‘জিরো পয়েন্ট’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, চৈত্র ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৭০

৩৮। বিশ্বাস, শিশির, ‘লাশঘর’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা ৭৮

৩৯। বিশ্বাস, শিশির, ‘ঘন ডালের অন্ধকারে’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, চৈত্র ১৪২৪, পৃষ্ঠা ১৮

৪০। তদেব, পৃষ্ঠা ৯

৪১। দাশগুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর, ‘সাইক্লিস্ট’, শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটির, আশ্বিন ১৪২০, পৃষ্ঠা ৮৯

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে প্রাগাধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভূতেদের উপস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হবার পরই ভূতেদের অস্তিত্ব মানুষের মনে প্রকট হয়ে উঠেছে। পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক এই বৈপরীত্যের ধারণায় লোকবিশ্বাসে দেবতা এবং ভূত দুই ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করলেও পুরাণের কাল থেকে দেবতা এবং ভূতদের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এর নিদর্শন মেলে। ভূতেদের স্বতন্ত্র উপস্থিতির পরিবর্তে দেবতাদের অনুচর হিসাবেই এই পর্বে তাদের আত্মপ্রকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশ বিশ শতকের ছোটদের ভূতের গল্পের জগত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের পাশাপাশি এই সময় থেকে পরলোক চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পাশ্চাত্যের অনুসরণে তৈরি হয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি। প্রেতচক্র তৈরি করে প্ল্যানচেট করবার হিড়িক শুরু হয় এই সময় থেকেই। পাশ্চাত্যের মতো পরলোক চর্চা বাঙালির কাছে জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেনি। ব্যতিক্রমী দুএকজন ছাড়া বিনোদনের এবং কৌতূহলের সঞ্চার করল মাত্র। এরফলে বিশ শতকে পরলোক চর্চা তার প্রাসঙ্গিকতা হারাল। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে ছোটদের গল্পের জগতের সঙ্গে বড়দের গল্পের আখ্যান ও বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশু কিশোরদের গল্পের জগৎকেই তুলে ধরা হয়েছে। যৌনতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি এই সময় পর্বের শিশু কিশোর পাঠ্য গল্পে স্থান পায়নি। ভৌতিকতার মোড়কে বরং এই সময় পর্বের গল্প অনেক বেশি নীতিকথাধর্মী। ‘ভালো ভূত’, ‘খারাপ ভূত’ ধারণার এই বৈপরীত্যে বাঁধা।

তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত গল্পগুলির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশে

একমুখী নয়। এই সময়ে গল্পগুলোতে শ্রেণি বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। ‘হাইটেক সিটির’ জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায় এই সময়ের গল্পগুলোতে। ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি সমালোচনাও লক্ষ করা যায়। বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গতার ছবি এই সময়ের গল্পগুলোতে উঠে আসে। পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার ছবি গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জগৎ সর্বজ্ঞাত হওয়ায় এই সময়ের শিশু কিশোরদের মধ্যে ‘ক্ষমতা’ এবং ‘আত্ম’-এই ধারণার জন্ম হয়। যৌনতার অনুসঙ্গ এই সময়ের গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা লক্ষ করেছি শিশু এবং কিশোরের মানসিকতার দূরত্ব এই সময় থেকেই বেড়ে যায়। সেকারণে ‘শিশুকিশোর’ এই একই শিরোনামে তাদের মনস্তত্ত্বকে আর পড়া সম্ভব নয়। এই শিরোনাম বিকল্পের দাবি রাখে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গল্পগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করেছি বৈঠকি গল্পের ধরণ উঠে গিয়ে এই সময়ের গল্পগুলোতে কথক ও শ্রোতার অবস্থান বদল হয়। কাহিনিকাল এবং সংঘটন কালের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে। ‘অতীত’ কেবলমাত্র সময় সূচক ধারণা হয়ে থাকল না। পাশাপাশি আধুনিক ভাষা ব্যবহারও লক্ষ করবার মতো। কেবলমাত্র ভৌতিক আবহ নয়, এর সঙ্গে অলৌকিক, রহস্য ও কল্পবিজ্ঞান মিশে একুশ শতকে ভূতের গল্পে এক মিশ্র সংরূপ নির্মিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট - ১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৯৬

১। কে ও? - মঞ্জিল সেন, পৃষ্ঠা ৭০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৬

১। শিবু খুড়োর গল্প - স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৪৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। ভূত - অরুণ দে, পৃষ্ঠা ১৭০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। ভূতুড়ে বাড়ি - ইভা খাসনবীশ, পৃষ্ঠা ২৪৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। শিমূলতলীর ভূতের গল্প - অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৩১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৯৭

১। ডনের ভূত - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পৃষ্ঠা ২২৮

২। খুনী - মানবেন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ২০৩

৩। জীবন থেকে নেওয়া - গৌরী দে, পৃষ্ঠা ১৯৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৩৯৭

১। হোইচির গল্প - শ্যামলী বসু, পৃষ্ঠা ৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), পৌষ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। সুধাংশুবাবু ছড়ি - সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), মাঘ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। বহাড়ু, ডুংরি বাংলোয় এক রাতে - রণেন বসু, পৃষ্ঠা ২৭৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৭

১। মধ্যরাতের অতিথি - নির্মল বন্দোপাধ্যায় পৃষ্ঠ ১৫১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৯৮

১। অবিশ্বাস্য - প্রবোধ বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৩৯১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৯৮

১। আতঙ্ক - মানবেন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ৪৭১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৯৮

১। দুঃখীরাম শান্তিরাম - মণিলাল মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৮

১। ঘুমের দেশে - রণেন বসু, পৃষ্ঠা ৯৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৯৯

১। ওয়েটিং রুমে সেই রাতে - প্রভাস মল্লিক, পৃষ্ঠা ১৬৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৯৯

১। লগ ব্লকের ছেঁড়াপাতা - সঙ্কর্ষণ রায়, পৃষ্ঠা ২৩৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৯৯

১। অদৃশ্য বন্ধু - বসন্ত ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৩৫১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৯৯

১। প্রায় ভৌতিক - সঞ্জীব কুমার দে, পৃষ্ঠা ৩৮০

২। রাঙাদিদা ও ফুলকুমারী - বিরাজ ভদ্র, পৃষ্ঠা ৪১৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৯৯

১। পারঘাট - সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৭

২। মামাশ্বশুরের বাড়ি - বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৩৯৯

১। প্লানচেট - প্রবোধ নাথ, পৃষ্ঠা ১৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৯৯

১। ভাঙা কেবিনের ভূত - বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৫

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), পৌষ সংখ্যা, ১৩৯৯

১। অন্ধকার সিঁড়ি - মানবেন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ৬১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৯৯

১। চশমা - দেবল দেববর্মা, পৃষ্ঠা ৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৪০০

১। অলৌকিক জীপ - পরেশ দত্ত, পৃষ্ঠা ২০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৪০০

১। নন্দলাল - গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৫

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪০০

১। মাঝরাতের জলসায় - শিশির কুমার মজুমদার, পৃষ্ঠা ২০

২। চেনাশোনা ভূত - রবিদাস সাহারায়, পৃষ্ঠা ৩৫

৩। শয়তানের জাগরণ - ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪০০

১। যমজ বোন - বরুণ দত্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০০

১। পরপোকারী ভূত - বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪১

২। ভৈরব - মানবেন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ১৭৯

৩। ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজে - অজেয় রায়, পৃষ্ঠা ৯৯

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪০০

১। পিণ্ডিদান - প্রবোধ নাথ, পৃষ্ঠা ৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪০০

১। ভয় থেকে ভূত - তুষার সরদার, পৃষ্ঠা ৬৫

২। হিলির ডাকবাংলোয় - হিমাংশু সরকার, পৃষ্ঠা ২৫

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, ১৪০১

১। ভূতুড়ে খেলোয়াড় - রবিদাস সাহারায়, পৃষ্ঠা ১০

২। সিধুমামার বাড়ি - অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৪

৩। কানে কানে কথা কয় - অসীম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৩৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪০১

১। ডাক দিয়েছিল সুধাম - অসীম চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০১

১। পুরনো রাজবাড়িতে - প্রফুল্ল রায়, পৃষ্ঠা ১৭৪

২। চোর বনাম ভূত - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পৃষ্ঠা ৮১

৩। লোকটা কে - বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০২

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪০১

১। লংসাহেবের ছায়া - রমেন দাস, পৃষ্ঠা ৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪০২

১। সেই রহস্যময় কলম - স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২

২। সুধাময় ও সেই লোকটা - দেবজয় মিশ্র, পৃষ্ঠা ৬

৩। অন্ধভূত - রবিদাস সাহারায়, পৃষ্ঠা ৬১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪০২

১। অদ্ভুত ভূতের গল্প - প্রবোধ নাথ, পৃষ্ঠা ৫০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০২

১। আম কুড়োতে সাবধান - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পৃষ্ঠা ১৩

২। কয়লা খনির ভূত - মঞ্জিল সেন, পৃষ্ঠা ১৫৭

৩। জীবন্ত পুতুল - বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০৩

১। পর্যটক রহস্য - অজেয় রায়, পৃষ্ঠা ৫৬

২। ভূতেরা আজও আসে - হীরেন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৪০৪

১। বাঁশবনের বামনী - মঞ্জিল সেন, পৃষ্ঠা - ২৯

২। নীল দিঘির ভূত - সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪০৪

১। বাচ্ছা ভূতের খপ্পরে - নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৬

২। সেই ছবিটা - অরুণ কুমার হালদার - পৃষ্ঠা ২৮

৩। সত্যি ভূতের গপ্পো - কৌশিক কুমার মাইতি, পৃষ্ঠা ৩৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪০৫

১। শীত সন্ধ্যার ঝড়-বৃষ্টি - অশোক কুমার সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৫

২। ঝাড়গ্রামের ঝড় - তুষার ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২১

৩। গাবেশ্বরী - কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩০

৪। নাচুনে ভূত - অগ্নিমিত্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪০৫

১। ক্যামেরা - নীলাঞ্জন নন্দী, পৃষ্ঠা ৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), মাঘ সংখ্যা, ১৪০৫

১। জমিদার বাড়ির ভূত - সৌরভ ভক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

২। গুপ্তধন - সঙ্কর্ষণ রায়, পৃষ্ঠা ২৫

৩। একটি মৃত্যু ঃ অনেক জীবন - শ্যামাপদ কর্মকার, পৃষ্ঠা - ৭০

৪। পিশাচের খপ্পরে - পীযূষকান্তি চন্দ, পৃষ্ঠা ৩২

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪০৬

১। বেকুব ভূত - দিলীপ পন্ডিত, পৃষ্ঠা ৫৪

২। হাওয়া - আনন্দ বাগচী, পৃষ্ঠা ২৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৪০৬

১। টান - মধুসূদন বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৫৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৪০৭

১। প্রসাদ - মঞ্জিল সেন, পৃষ্ঠা ৬৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪০৭

১। চন্দ্রবিন্দুর চমক - বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৭০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৪০৮

১। জিহাদপুরের সেই লোকটা - অনীশ দেব, পৃষ্ঠা ২৫

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪০৮

১। শেষ ট্রেনের যাত্রী - অশোক কুমার সেনগুপ্ত পৃষ্ঠা ৬

২। সিনেমা ভূত - নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৬

৩। বোম্বাইকা গাড়ি - কল্যাণ মৈত্র, পৃষ্ঠা ৭০

৪। ট্রেন রহস্য - শ্রীবাস সাহা, পৃষ্ঠা ৩১

৫। মামদো ভূতের গল্প - গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪০৮

১। সিল্কের রুমাল - পরেশ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১৮

২। পৈশাচিক - অশোক সী, পৃষ্ঠা ৫৯

৩। ভূতুড়ে বিজ্ঞাপন - কল্যাণ মৈত্র, পৃষ্ঠা ৬২

৪। মধ্যরাতের বাঁশি - পার্থসারথী চন্দ্র, পৃষ্ঠা ২২

৫। হৃদয়ের টানে - নাদিরা সুলতানা, পৃষ্ঠা ৭০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪০৯

১। ভূত মানে ভয়ঙ্কর নয় - অরুণ কুমার দত্ত, পৃষ্ঠা ৩২

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৪১০

১। ভূতের দেখা - প্রতাপলাল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, ১৪১০

১। অশরীরী - প্রদ্যোৎ মিত্র, পৃষ্ঠা ৬৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ভাদ্র সংখ্যা, ১৪১০

১। নিশুতি রাতের ছায়া - ঘনশ্যাম চৌধুরি, পৃষ্ঠা ১৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪১০

১। বেনেটির জঙ্গলে - হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২১

২। বেনী বাগানের রহস্য - অশোক কুমার সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৫৩

৩। শীতের রাতের ট্রেন - অসীম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৩৭

৪। সত্যি ভূতের গল্প - শ্যামাপদ কর্মকার, পৃষ্ঠা ১৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১০

১। নিশিরাতে - দূর্বা বাগচী, পৃষ্ঠা ৬

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪১০

১। ভূতনাথের ভূত - শুভ মানস ঘোষ, পৃষ্ঠা ৬৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৪১০

১। ডাকবাংলো রহস্য - জয়ন্ত বসু, পৃষ্ঠা ২৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১১

১। রক্তের স্বাদ - হীরেন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫

২। অশরীরিনী - বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৭

৩। দায়িত্ববোধ - প্রবীর হালদার, পৃষ্ঠা ৬০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪১১

১। মধু বোষ্টমের আখড়া - অমিতাভ পাল, পৃষ্ঠা ৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১১

১। ছায়ায়-মায়ায় - সঞ্জীব কুমার দে, পৃষ্ঠা ৮

২। ভূত বনাম ভগবান - বিভূতিভূষণ মন্ডল, পৃষ্ঠা ৭১

৩। রাতের আশ্রয় - দীপালি ঘোষাল, পৃষ্ঠা ৩৯

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৪১২

১। নিঝুম রাতের বাঁশি - জয়দীপ সেন, পৃষ্ঠা ৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১২

১। রেল লাইনে গণ্ডগোল - স্মরজিত রায়, পৃষ্ঠা ৭০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১২

১। অদৃশ্য ব্যাপার-স্যাপার -মানবেন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ১৮

২। এই মুহূর্তে - নির্মলেন্দু গৌতম, পৃষ্ঠা ৭১

৩। প্রত্যাবর্তন - রাম প্রসাদ দে, পৃষ্ঠা ৫৯

৪। এক ঐতিহাসিক প্রেতাত্মা - আদিত্য বোস পৃষ্ঠ ৬৮

৫। ভয়ঙ্কর সেই রাত - পারমিতা সিন্‌হা, পৃষ্ঠা ৪৯

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১২

১। হলুদ গোলাপ - বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮

২। কবরডাঙার ভূত - উত্থানপদ বিজলি, পৃষ্ঠা ১৭

৩। তবে সে কে ছিল - রোহিত দত্ত, পৃষ্ঠা ৭৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১৩

১। অশরীরীর হাতছানি - প্রশান্ত বর্মন রায়, পৃষ্ঠা ৩৯

২। মুশকিল আসান - মিন্টু প্রামাণিক, পৃষ্ঠা ৫৬

৩। জেফারসন লজ - গৌরী দে, পৃষ্ঠা - ৬৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪১৩

১। শয়তান বেড়াল - গৌরী দে, পৃষ্ঠা - ৭০

২। শেষ সংকেত - অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭

৩। ঐতিহাসিক ভূত - শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১৩

১। কমেডিয়ান রামু - বিপুল মজুমদার, পৃষ্ঠা ৬৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১৪

১। ভূতুড়ে হাড় - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পৃষ্ঠা ৮

২। রাত যত বাড়ে - প্রণব মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১১

৩। বাতিঘর - ফাল্গুনী মণ্ডল, পৃষ্ঠা ৭৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১৪

১। তিন বছর পর - নির্মলেন্দু গৌতম পৃষ্ঠা ২২

২। ভূতের কবি - মহিম ঘোষ, পৃষ্ঠা ৭১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১৫

১। দেখা হবে মাঝ রাতে - শুভমানস ঘোষ, পৃষ্ঠা ৮

২। আত্মা মরে না - মণিলাল মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬

৩। দুঃখহরণ - মনোকান্তি ঘোষ, পৃষ্ঠা ৫৬

৪। হেকরথ সাহেবের শেষ পরিণতি - প্রসেনজিৎ শীল, পৃষ্ঠা ৩৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১৭

১। মধ্যরাত্রির আগুন্তুক - রাজেশ বসু, পৃষ্ঠা ২০

২। ডুয়েল সিমেট্রি - রীতা বসু, পৃষ্ঠা ২৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১৭

১। ডাকাত কালীর মাঠ - গৌতম বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৫৯

২। অভিশপ্ত - অর্ক পৈতন্ডী, পৃষ্ঠা ২৩

৩। চলমান তুলি - দীপালি ঘোষাল, পৃষ্ঠা ৫০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১৮

১। রক্তের নেশা - গৌরী দে, পৃষ্ঠা ২৩

২। হারানো প্রাপ্তি - শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫০

৩। রক্ষক - সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪১৮

১। স্নেহ ছায়া - সঞ্জীব কুমার দে, পৃষ্ঠা ৮

২। ফকির মন্ডলের পুথি - কুমার মিত্র, পৃষ্ঠা ২০

৩। হিমাংশুদার ডাকে - কুশল মজুমদার, পৃষ্ঠা ৩০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১৮

১। ভয়ঙ্কর গাছ - সিদ্ধার্থ সিংহ, পৃষ্ঠা ৫১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১৯

১। কঙ্কাল - রূপক চট্টোরাজ, পৃষ্ঠা ১৪

২। রাতের মেকানিক - বসন্ত ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪৫

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪১৯

১। জটা তান্ত্রিকের ভূত গোয়েন্দা - স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ২৩০

২। রক্তের দাগ - পরেশ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা - ২৯৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪১৯

১। বইমেলার ভূত - সুজিত হালদার, পৃষ্ঠা ৮

২। মুক্তি - মধুমিতা বুধিরাজা, পৃষ্ঠা ২৪

৩। সে তবে কে - কল্যাণ মজুমদার, পৃষ্ঠা ৬১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪২০

১। সানরাইজ লজ - সুচিত্রা ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২৯

২। সাইক্লিস্ট - হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৮৮

৩। মিউচুয়াল আর কী? - শুভমানস ঘোষ, পৃষ্ঠা ১৩৮

৪। এক ভূত মানুষের গল্প - মহুয়া দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৮১

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪২০

১। কুহেলি মায়ায় - সঞ্জীব কুমার দে, পৃষ্ঠা ১৮

২। পিছুটান - প্রীতম কুমার রায়, পৃষ্ঠা ৫৪

৩। কেশপাশ - মীরা দেবী, পৃষ্ঠা ৬০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪২০

১। তাদের খোঁজে - প্রফুল্ল রায়।, পৃষ্ঠা ৫৩

২। আমি আছি ভেতরে - দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮

৩। বেড়ালের আঁচড় - বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪২১

১। শয়তানের ভালোবাসা - গৌরী দে, পৃষ্ঠা ২৮

২। ‘এইট বির’ ভূত - দীপঙ্কর গোস্বামী, পৃষ্ঠা ১৮

৩। মিতুল - সায়ন্তনী পলমল, পৃষ্ঠা ২৪

৪। ধাক্কা খেলেন পটল চন্দ্র - পিন্টু পোহান, পৃষ্ঠা ৬১

৫। মাঝরাতের কল - সৌরভ কুমার ভুঁইয়া, পৃষ্ঠা ৫০

৬। স্টেশনের আতঙ্ক - অরিন্দম ঘোষ, পৃষ্ঠা ৫৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), মাঘ সংখ্যা, ১৪২১

১। ঘোষ্ট হান্টার - হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৯

২। মুক্তিদাতা - বিপুল মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৬

৩। নো নম্বর ডাকছে - শোভন পাঠক, পৃষ্ঠা ২৬

৪। বাইশে শ্রাবণ - কৃষ্ণচন্দ্র রায়, পৃষ্ঠা ৩২

৫। ভূতেরা ভূতের গল্প লিখছে - মহাশ্বেতা দেবী, পৃষ্ঠা ৫৮

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪২১

১। এ কি? - সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৩

২। ডিসেকশন রুমে - গৌরী দে, পৃষ্ঠা ২৪৬

৩। জেনুইন বন্ধু - শুভমানস ঘোষ, পৃষ্ঠা ১০৭

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪২২

১। ভূতের বিপ্লব - দীপ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২৫৫

২। অনিলিখা ও ভূত - অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১৮০

৩। একটা ভূত পাখির গল্প - মহুয়া দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪২৩

১। কুয়াশা থেকে সাবধান - ত্রিদিব কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২৬

২। লাশঘর - শিশির বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৭৬

৩। বিপিনবাবুর ঠিকানা - রূপক চট্টরাজ, পৃষ্ঠা ৪৪

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৪২৪

১। ঘন ডালের অন্ধকারে - শিশির বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ১৮

২। রহস্যভেদীর রহস্য - গৌতম ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪২

৩। দৈত্যের বাগানে কিছুক্ষণ - শাশ্বতী চন্দ, পৃষ্ঠা ৫২

৪। আমি ভূত দেখেছি - রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬০

শুকতারা, রূপা মজুমদার (সম্পা.),আষাঢ় সংখ্যা, ১৪২৪

১। অঙ্কীয় গ্রন্থ - কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯

২। মর্নিং ওয়াক - দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩

৩। নিব ভাঙা কলম - হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৪২

৪। সহযাত্রী - তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ৫৩

৫। দিনের বেলাতেও ভূত দেখা যায় - প্রচেত গুপ্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

পরিশিষ্ট - ২

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৯৬

১। জ্যোৎস্না রাতের বিপদ আপদ - জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৫৯

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৯৭

১। আকালের ভূত - বাণীব্রত চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৫৬

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৯৭

১। একেই কি বলে কুয়াশা - এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ২৬

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। আমাদের জিপসি - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩২

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। বালিডাঙার মাঠ - ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ২৬

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৯৭

১। ভূতুড়ে গড়ির যাত্রী - কণা বসু মিশ্র, পৃষ্ঠা ৩৪

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৮

১। একটি ভৌতিক রেল ট্রলি - বিমল কর, পৃষ্ঠা ১৫

২। কেন দেখা দিল না - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯

৩। টেলিফোনে - শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৩

৪। তিন আঙুলে দাদা - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পৃষ্ঠা ৬২

৫। অন্যমহিম - রতনতনু ঘাটী, পৃষ্ঠা ৭৫

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), মাঘ সংখ্যা, ১৩৯৯

১। রাতটা ছিল দুর্যোগের - সমরেশ মজুমদার, পৃষ্ঠা ৬৪

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), মাঘ সংখ্যা, ১৪০১

১। পুতুলের ভয় - অলোক মান্না, পৃষ্ঠা ৫৬

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৪০১

১। ভূতের চেয়ে ভয়ঙ্কর - হীরেন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৬

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), মাঘ সংখ্যা, ১৪০২

১। পায়ের শব্দ - দীপ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫০

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০৪

১। নীল গোলাপ - বাণীব্রত চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১৮

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪০৫

১। অবাক চশমা - মণিশঙ্কর দেবনাথ, পৃষ্ঠা ৫৫

২। নিজেকে দেখা - দীপঙ্কর দাস, পৃষ্ঠা ২৮

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), কার্তিক সংখ্যা, ১৪০৮

১। ভূতের মতো - কানাই কুন্ডু, পৃষ্ঠা ২৭

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৪০৮

১। ফাঁকা ছাদে, অন্ধকারে - শৈবাল চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২১

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪১১

১। ভূতের ঘোড়ার গাড়ি ও কালো বাক্স - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬

২। ভূত বাগান - সুমন নাথ, পৃষ্ঠা ৪২

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), বৈশাখ সংখ্যা, ১৪১২

১। ধুলোটে কাগজ - শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯

২। যত অন্ধকার তত ভূত - অশোক বসু, পৃষ্ঠা ৩৩

৩। আম বাগানের ভূত - সুকুমার রুজ, পৃষ্ঠা ৭২

৪। ভূতুড়ে রোলার - বিপুল মজুমদার, পৃষ্ঠা ৮০

আনন্দমেলা, অভীক সরকার (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪১২

১। অলৌকিক সিঁড়ি - শিশির বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৪৮

আনন্দমেলা, পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪১২

১। রাত-বিরেতেই হয়ে থাকে - সমরেশ মজুমদার, পৃষ্ঠা ৭

২। বিনে পয়সার কঙ্কাল - শান্তনু কুন্ডু, পৃষ্ঠা ১৫

৩। বন্ধু ভূত - সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫০

৪। আক্কেল গুড়ুম - শিশির বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ৫৫

আনন্দমেলা, পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পা.), আশ্বিন সংখ্যা, ১৪১৫

১। ভবিষ্যতের ভূত - দীপ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৩

আনন্দমেলা, পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পা.), ফাল্গুন সংখ্যা, ১৪২১

১। নিশিরাতের ডাক - সুচিত্রা ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৮

২। সেগুন পাতার চিঠি - তিলোত্তমা মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৬

৩। স্টেশনে আসেন রজত সেন - প্রচেত গুপ্ত, পৃষ্ঠা ২৬

৪। ভূতপর্ব - দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩২

৫। মৃত বন্ধুর সঙ্গে দেখা - প্রণব ঘোষ, পৃষ্ঠা ৪২

আনন্দমেলা, পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পা.), চৈত্র সংখ্যা, ১৪২২

১। যাদের দেখা যায় না - ঋতিকা নাথ, পৃষ্ঠা ১৮

২। ভূতের বাজার - ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬

আনন্দমেলা, পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পা.), আষাঢ় সংখ্যা, ১৪২৪

১। বন্ধু - তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০

২। ভানগড়ের পাহারাদার - রীতা বসু, পৃষ্ঠা ২৪

৩। বীরেনবাবুর প্রশ্ন - সায়ন্তনী পুততুণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০

৪। তেনাদের হুমকি - অঞ্জন সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৪২

পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জি

[ক] আকর পত্রিকা

১। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪১৭

২। আনন্দমেলা, সম্পা. অভীক সরকার, বৈশাখ ১৩৯৯

৩। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২১

৪। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪১৭

৫। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২০

৬। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪১৭

৭। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪১৭

৮। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২০

৯। আনন্দমেলা, সম্পা. অভীক সরকার, ফাল্গুন ১৪১৬

১০। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২২

১১। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, চৈত্র ১৪১৮

১২। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪০৩

১১। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, চৈত্র ১৪১৮

১২। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪০৩

১৩। আনন্দমেলা, সম্পা. অভীক সরকার, ফাল্গুন ১৪১৫

১৪। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪২৫

১৫। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪২২

১৬। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, মাঘ ১৪২১

১৭। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, ফাল্গুন ১৪২২

১৮। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪২৩

১৯। আনন্দমেলা, সম্পা. পৌলমী সেনগুপ্ত, ফাল্গুন ১৪২১

২০। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২১

২১। আনন্দমেলা, সম্পা. পৌলমী সেনগুপ্ত, আষাঢ় ১৪২২

২২। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২২

২৩। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, চৈত্র ১৪২৪

২৪। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, মাঘ ১৪২১

২৫। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪১৮

২৬। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, ফাল্গুন ১৪২২

২৭। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪২৫

২৮। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪২৫

২৯। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪২৩

৩০। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪২১

৩১। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪১৭

৩২। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৩৯৩

৩৩। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২৩

৩৪। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪২২

৩৫। আনন্দমেলা, সম্পা. অভীক সরকার, ফাল্গুন ১৪১৫

৩৬। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২১

৩৭। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪২১

৩৮। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, চৈত্র ১৪১৬

৩৯। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, ফাল্গুন ১৪২১

৪০। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আষাঢ় ১৪২১

৪১। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, মাঘ ১৪২১

৪২। আনন্দমেলা, সম্পা. পৌলমী সেনগুপ্ত, ফাল্গুন ১৪১৬

৪৩। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, মাঘ ১৪২২

৪৪। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, কার্তিক ১৪২৩

৪৫। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, চৈত্র ১৪২৩

৪৬। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২৩

৪৭। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২০

৪৮। শুকতারা, সম্পা. রূপা মজুমদার, আশ্বিন ১৪২৫

[খ] সহায়ক পত্রিকা

১। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৪, পৃষ্ঠা ৮

২। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৪, পৃষ্ঠা ৮

৩। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২০

৪। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৫০
৫। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৮, পৃষ্ঠা ২৩
৬। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৫১
৭। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৯, পৃষ্ঠা ২৯৪
৮। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪২০ পৃষ্ঠা ৬০
৯। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃষ্ঠা ৬১
১০। শুকতারা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৮
১১। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ৫৬
১২। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ২৬
১৩। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ৩২
১৪। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চৈত্র ১৩৯৮, পৃষ্ঠা ২৩
১৫। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চৈত্র ১৩৯৮, পৃষ্ঠা ৭৫
১৬। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০১, পৃষ্ঠা ৫৬
১৭। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃষ্ঠা ২৮
১৮। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১২, পৃষ্ঠা ৩৩
১৯। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১২, পৃষ্ঠা ৭
২০। আনন্দমেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৬
২১। আচার্য, অনিল (সম্পা.), অনুষ্টুপ, ৫২ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৮
২২। উদয় রতন (সম্পা.), সহিত্য তক্কো, কলকাতা, হিমেল ১৪২০

[গ] সহায়ক গ্রন্থ

১। দেব, অনীশ, *ভৌতিক অলৌকিক*, পত্রভারতী, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮
২। দেব, অনীশ, *অশরীরী ভয়ঙ্কর*, পত্রভারতী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৪
৩। দেব, অনীশ, *সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক*, পত্রভারতী, কলকাতা, জুলাই, ২০১৮
৪। আব্দুল, কাফি ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋকসুন্দর (সম্পা.), *ছায়া শরীর*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৭
৫। ঘোষ, অমল কুমার, *বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯
৬। দাস, অমিতাভ, *আখ্যান তত্ত্ব*, ইন্দাস, কলকাতা, নভেম্বর ২০১০

৭। বাগচী, অমিয়, *বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০০০

৭। চক্রবর্তী, উদয়, *নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* গ্রন্থের ''ভূতের ভাষা'' শীর্ষক প্রবন্ধ, ইন্দাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৬

৮। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প,* ভট্টাচার্য, সৌরীন (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০০৪

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৫

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প,* চক্রবর্তী, যুগান্তর (সম্পা.), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা:. লি:., কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১২

১১। বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র,* বসু, দীপঙ্কর (সম্পা.), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা:. লি:., কলকাতা, অক্টোবর ২০১০

১২। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু ও মিত্র, অশোক কুমার (সম্পা.), *এক বাক্সো ভূত,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৯

১৩। সেন, সুকুমার, *গল্পের ভূত,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৯

১৪। সেন, সুকুমার, *গল্পের গাটছড়া,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৯

১৫। সেন, সুকুমার ও সেন, সুভদ্রকুমার (সম্পা.), *উপছায়া,* সিগনেট প্রেস, কলকাতা, মে ২০১৭

১৬। রায়, সত্যজিৎ, *গল্প ১০১,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১৭

১৭। সরকার, সুধীন্দ্র, *অলৌকিক ভৌতিক রহস্য,* পুনশ্চ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

[ঘ] অন্তর্জাল সূত্র

১। https://www.google.com/amp/www.prothom alo.com dated 12.01.2019, 8pm.

২। https://www.yourarticlelibrary.com dated 06.11.2018, 3am.